কাঁটাতারের কিস্‌সা কহানি

সীমান্তে কেন চাহিদা বেশি
পুরনো খবর কাগজ ও ক্যাসেটের?

বক্সা ফোর্টে বারবার গলাধাক্কা খায় ইতিহাস

মিডিয়া কি জ্যোতিষশাস্ত্রেও সিদ্ধ?
নাকি জনগণ হাঁড়িতে ফুটন্ত ভাত?

এখন ডুয়ার্স

১৫ মে ২০১৬। ১২ টাকা

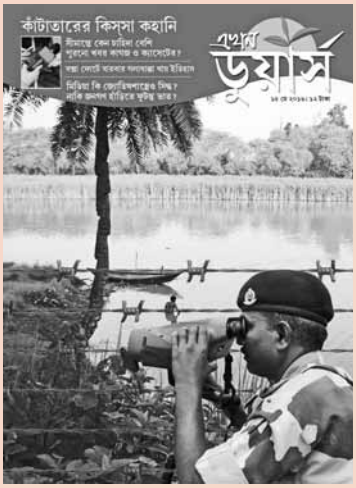

কাঁটাতারের পাঁচিল থাকুক্ তোলা
নিষিদ্ধ সব দরজা তবু খোলা
অন্ধকারে হাঁটার মানুষ হাঁটে
অন্ধকারেই সময় সাঁতার কাটে!

অন্ধকারের পথটা কোথাও মেশে
নেপাল, ভুটান কিংবা বাংলাদেশে
পণ্য মানুষ পাচার হতে থাকে
নিষিদ্ধ পথ আঁধার থেকে ডাকে!

যতই থাকুক্ কাঁটাতারের বেড়া
যতই থাকুক্ নজরদারির ঘেরা
যতই থাকুক্ আইন বাড়াবাড়ি
হচ্ছে পাচার পণ্য-গরু-নারী!

সীমান্তে ঐ উড়ছে কালো টাকা
এ পার ও পার পর্দা দিয়ে ঢাকা
লেনদেনে হয় মাদক চালাচালি
বাইরে সবুজ, ভেতর জোড়াতালি!

ছন্দে ঃ অমিত কুমার দে
ছবিতে ঃ শান্তনু সরকার

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ২/২ সংখ্যা
১৫-৩১ মে ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৩

নির্বাচনের ডুয়ার্স
মিডিয়া কি জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধ? ৪

স্পেশাল ডুয়ার্স
যেখানে বারবার গলাধাক্কা খায় ইতিহাস ৭

দূরবিন
সাংসদের গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রকট হল
উত্তরবাংলার চিকিৎসাব্যবস্থার হাল ১২

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ
এপার-ওপার মিলেমিশে একাকার ১৫
ফিতের টানে চলছে পারাপার ১৮
সীমান্ত পারাপারে যাত্রীরা নাজেহাল
ফুলবাড়ি চেকপোস্টে ২০

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
জলাভাবে ধুঁকছে আত্রেয়ী নদী
সৌজন্যে বাংলাদেশ ২৪
অফ ইয়ারেও মালদায়
আমের রেকর্ড ফলন ২৬
বিলুপ্তির পথে বালাস গ্রামের
কাঠপুতুল নাচ ২৬

পর্যটনের ডুয়ার্স
বছরভর বারবার যাওয়া যায়
কালীপুর ইকো ভিলেজ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ২২
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৬
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০

খেলাধুলায় ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ময়দানে শূন্যতা ৪১

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৭
তরাই উৎরাই ২৯
লাল চন্দন নীল ছবি ৩১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৩৮
প্রশ্ন-উত্তর ডট কম ৩৯
স্মৃতির ডুয়ার্স ৩৯
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৩
শখের বাগান ৪৩

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/
aaddaghar

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল-
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি-
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

সম্পাদকের ডুয়ার্স

টক বা তেতো এ সময় সবার পক্ষেই স্বাস্থ্যকর

বিপন্ন বিরোধীরা এবার বেজায় খুশি। কারণ তাঁদের মতে, গণতন্ত্র রক্ষায় বা পুনরুদ্ধারে নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যমের বেনজির ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল এ রাজ্যের ভোটদাতারা, যা নাকি গোটা দেশের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার যোগ্য। অস্বীকার করার উপায় নেই, শেষ পর্বে পৌঁছে শাসকবাহিনীর গলা খানিকটা হলেও শুকিয়েছে। যুযুধান দুই পক্ষ ফলাফল নিয়ে যে দাবিই করুক না কেন, বিশেষজ্ঞর বিশ্লেষণে যে চিত্রটি এ যাবৎ কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে তা হল— গদি দখলের ম্যাজিক অঙ্কটি যার বরাতেই জুটুক, অর্জিত অঙ্কের ব্যবধান হবে যৎসামান্য। অর্থাৎ সাবধানি বিশেষজ্ঞর দল পুরোপুরি ঝেড়ে না কাশলেও এটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ক্ষমতায় যে-ই আসুক, বিরোধীরা এবার যথেষ্ট শক্তিশালী হবে নিঃসন্দেহে, যা আরও একবার গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

বিরোধীরা আদৌ কতটা শক্তিশালী হবে বা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ হলেও গণস্বার্থের জন্য তা কতটা কার্যকরী হবে, সেসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কি না কারও জানা নেই। ক্ষমতাসীন দলের ভিতই যদি নড়বড়ে থাকে, তবে বিরোধীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাপে বহু সিদ্ধান্তেরই বাস্তবায়িত হওয়া ব্যাহত হবে। এ রাজ্যের বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস অন্তত তা-ই বলে। এ ছাড়া ক্ষমতা দখলের লোভে দল ভাঙাগড়ার অনুশীলন চলতেই থাকবে। ফলে রাজ্যের ভবিতব্য রসাতলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। দিল্লির প্রভাব বা অঙ্গুলিহেলন জারি থাকবে নিঃসন্দেহে, তারা পশ্চিবঙ্গের ভালমন্দ নিয়ে কোনও দিনই ভাবিত নয়। যদি কোনও কারণে এবারের এই নির্বাচনের ফলাফলে কোনও দল একা সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে তা কিন্তু রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল এই কার্টুন

তবে রাজ্যের মিঠাই ব্যবসায়ীদের মন কিন্তু এবার যথেষ্ট খারাপ। তাদের মত, দিদিই জিতবেন, কিন্তু আসন অনেক কমে যাবে বলে তাঁর মেজাজ মোটেও প্রসন্ন থাকবে না। আর দিদির মুড 'অফ' থাকলে ভাইদের মুড 'অন' থাকে কী করে বলুন? অতএব ফল বেরলেও মিঠাই বণ্টনের উৎসাহ থাকবে না কারওই। তার উপর হেরে-টেরে গেলে ওসব প্রশ্নই নেই। আর জোট? ও তো ভোট শেষ না হতেই হাওয়া। দিদিকে হটাতে না পারলে তো হয়েই গেল, তখন 'মিঠাই নয়, পিটাই' ঠেকাতেই নাকি তারা সব ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি জিতে যায়? ধুর, গোঁফে তেল দিয়ে বাবুরা তো এখনই ভাবতে বসেছেন, কাঁঠাল পাকলে কতটুকু ভাগ কে নেবে! মিঠাই নিয়ে ভাবার সময় কি তাঁদের আছে?

মা-দিদিমারা বলতেন, অতিরিক্ত মিঠাই মেদ বাড়ায়, টক বা তেতো খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। এবারের মসনদের লড়াইয়ের ফলাফল যদি কমবেশি টক বা তেতো গিলতেই হয়, তবে তা মমতাও তাঁর দলের স্বাস্থ্যোদ্ধারে যেমন কাজে লাগতে পারেন, তেমনই টক বা তেতো ফল পরখ করে দেখতে পারেন জোটের বন্ধন কতটা মজবুত। এতে আখেরে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যের উন্নতি আশা করতে পারে ক্রমাগত ক্ষীণকায় এ রাজ্যের ভোটদাতারা।

মিডিয়া কি জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধ ?

নাকি জনগণ হাঁড়িতে ফুটন্ত ভাত ?

দেশের অন্যান্য সব রাজ্যের মতো এ রাজ্যের ভোটাররা নন। ভোট কাকে দিচ্ছেন, ভোটের আগে বিহার-উত্তরপ্রদেশ বা দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ-তামিলনাড়ুতে গেলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন সেখানকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছুতেই সরাসরি বলতে চান না এবার কাকে ভোট দেবেন ভাবছেন বা কে জিতবে! জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন, দেখুন কী হয়! বা হাওয়া বোঝা মুশকিল ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ রাজ্যের সংবাদমাধ্যম মানুষের 'মুখে কুলুপ'-এর এই সুযোগ নিয়ে নির্বাচনী বিশ্লেষণ বা পূর্বাভাস দিচ্ছে ঘরে বসেই। এ সময় বিখ্যাত এক সাংবাদিকের উক্তি প্রাসঙ্গিক— সাংবাদিকদের যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভিড়ে আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবে, ততক্ষণ তাঁরা মানুষের মনের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না, আসল খবরও বার হবে না।

গত মাসের গোড়ার কথা। পড়ন্ত দুপুরের তেরচা তেজে সেদ্ধ হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত একটি গঞ্জ। ঢিমে তালে চলাফেরা করছিল আশপাশের অঞ্চল থেকে আসা ও স্থানীয় মানুষ, দোকানি, চিলতে ছায়ায় খিদে ভুলে তন্দ্রাচ্ছন্ন নেড়ি। এমন সময় আচমকা কোত্থেকে এসে হাজির হল এক বিচিত্র যান। দেখতে মোটরগাড়ির মতো হলেও তার সারা গায়ে আঁকিবুকি ছবি, মাথায় পেল্লায় একখানা গামলামতন, খানিক ট্যারা হয়ে আকাশমুখী।

এক শিশু তার বাবার হাত ধরে সম্ভবত ইশকুল থেকেই ফিরছিল, হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিজ্ঞেস করল, বাবা, এটা কি মঙ্গল গ্রহের কোনও যান? এর ভিতরে কি ভিন গ্রহের জীব রয়েছে? নেড়ি খিদে ও তন্দ্রা ভুলে ছুটে গেল ঘেউ ঘেউ করে। আশপাশের সবাইকে অবাক রেখেই সে যানের দরজা খুলে নামল আঁটসাঁট পোশাকের এক তরুণী, হাতে তাঁর চোঙা। তাঁর পিছনে আরও দু'-তিনজন ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। শিশুর পিতা এবার উত্তর দিলেন, না রে বাবা, ওরা টিভির রিপোর্টার, এয়েছে খবর করতে।

এই পোড়ার গাঁয়ে আবার কোন খবরটা পেল ওরা? প্রশ্নকর্তা চা দোকানের বেঞ্চে বসা আধবুড়ো। মোবাইলের ছোকরা দোকানি উত্তর দিল, কাকা, ভোটের দিন এসে গেল না? এবার এখানে কে জিতবে, সে খবর করতেই এয়েছে ওরা। আমাদের খবর নিতে এত দূর আসতে বয়ে গিয়েছে ওদের!

তরুণী হাসিমুখে হাতের চোঙা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন দৃপ্ত ভঙ্গিমায়, পিছনে ক্যামেরা হাতে বলিষ্ঠ যুবক, তার পিছনে এক শিড়িঙ্গে। প্রত্যেকে যুক্ত রয়েছে কালো মোটা

তার দিয়ে। তরুণী সোজা এসে জিজ্ঞেস করলেন আধবুড়োকে, কী কর্তা, হাওয়া কেমন বুঝছেন? কাকে ভোট দিয়ে জেতাবেন এবার? আধবুড়ো ভ্যাবাচ্যাকা, মুখে রা নেই। উদ্ধারে এগিয়ে এল মোবাইল দোকানি। চোঙা এগিয়ে গেল তার মুখের কাছে। দোকানি ক্রিকেটারদের ঢঙে খানিক বকবক করল। চোঙা ও তরুণী এবার পাশের সেলুন দোকানে, গালে সাবান ফেনা মেখে উত্তর দিচ্ছেন খদ্দের, পিছনে হাসিমুখে নাপিত সাহেব, ছবি উঠছে যে!

খানিকক্ষণ এরকমই চলল, এ দোকান-সে দোকান। কেউ বলছে, কেউ কিছুই বলছে না। ততক্ষণে ভিড় জমে গিয়েছে আগন্তুকদের ঘিরে। তাদেরই একজন হঠাৎ বলে উঠল, চলো চলো, অনেক 'বাইট' হয়ে গিয়েছে, এবার যেতে হবে। চায়ের দোকান থেকে চার-পাঁচ কাপ লাল চা চলে এল অভ্যাগতদের জন্য— দাদা, একবার গেরামে চলুন, বুঝতে পারবেন আমাদের অসুবিধাগুলো। না দাদা, আজ আর হাতে টাইম নেই, আরও চারটে জায়গায় নামতে হবে, পরে আবার আসব। তরুণী মিষ্টি হেসে আপাদমস্তক ঢাকা অদ্ভুত যানে উঠে পড়লেন আর তাকে অনুসরণ করল বাকিরাও। দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার ফাঁকে গাড়ির ভিতর থেকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বেরিয়ে এসে লাগল পোড়া মুখগুলোয়। চোখের পলকে হুস করে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল ভিন গ্রহের যান।

সেই সন্ধ্যায় টিভির পর্দায় দেখা গেল সেই গঞ্জের দু'জনের মুখ, যদিও তা মিনিটখানেকও নয়। তারপরই সে গাঁয়ের দর্শকদের অবাক করে দিয়ে কোট-টাই পরা সুদর্শন তরুণ এসে এমন সব কথা বেদবাক্যের মতো বলে গেল, যা সে দিন দুপুরে ক্যামেরার সামনে কেউই বলেনি। মোবাইল দোকানিই ব্যাখ্যা করল পরদিন দুপুরে, বুঝলে কাকা, ওঁরা হলেন গিয়ে সব জ্যোতিষী! আর আমরা হলাম গে হাঁড়িতে ফুটন্ত ভাত! একজনকে টিপেই ওঁরা বুঝে যান বাকি সবার বক্তব্য।

গত দু'মাস ধরে নির্বাচনের রিপোর্টিং-এর নামে কাগজে বা টিভির পর্দায় যা দেখা গেল, তাকে একজন সচেতন নাগরিক ঠিক কী আখ্যা দেবেন? নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন? নাকি জনমত গঠনের নামে পাঠক ও দর্শককুলকে বিভ্রান্ত করা? নাকি খবরের খাস্তা মুচমুচে স্বাদ বজায় রাখতে নীতি ও রুচিবোধ ভুলে থাকা? নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, যখন দেখি কোনও রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক চিত্রটি ক্রমাগত প্রচার করে যাওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা। একটি বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যম যখন কারও সম্পর্কে 'যারে দেখতে নারি,

দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি এক নেতার রোজকার দিনলিপি ফলাও করে ছাপা বা সম্প্রচার হয় কেন বলতে পারেন? কিংবা সন্ত্রাসের কিংপিন বলে অভিযুক্তদের বক্তব্য বা চলাফেরার হালহকিকত কাগজের প্রথম পাতায় বা নিউজ চ্যানেলের হেডলাইনে বারংবার দেখানোটা সাংবাদিকতার কোন নীতিবোধ বা রুচিবোধের পরিণাম, সেটাই বলুন না 'স্টার' সাংবাদিকরা?

তার চলন বাঁকা' দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে পড়ে, তখন যে সমগ্র মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত লাগে, সে কথা আদৌ ভাবেন না সেই সংবাদমাধ্যমের নীতিনির্ধারকরা।

নির্বাচনের আগে সংবাদমাধ্যম কোনও এক পক্ষের বিরোধী ভূমিকা নিতে গিয়ে প্রকারান্তরে অপর পক্ষের সমর্থকের ভূমিকা নিয়ে যে সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাটিও লঙ্ঘন করে ফেলে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ আছে কি? শাসকদলের কুকর্মের কঠোর সমালোচনা মিডিয়ার ধর্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে বিকল্প শক্তির যোগ্যতার আগাম বিশ্লেষণ করার ধর্ম তারা বিস্মৃত হয় কী করে? পাঁচ বছর আগে মিডিয়া উত্তাল হয়েছিল বাম-সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের আবেগকে ক্লাইম্যাক্সে তুলে দিতে। কিন্তু নতুন পরিবর্তনের সরকার এসে আদৌ কতটা বদল আনতে সক্ষম হবে তা নিয়ে পূর্বাভাস বা আলোচনা করতে দেখা যায়নি কোনও কাগজ বা চ্যানেলে। বলাই বাহুল্য, এতে সচেতন করতে গিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তই বেশি করা হয়। ফলত, শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী হয় সাধারণ মানুষই।

আর মুখরোচক খবর পরিবেশনে মিডিয়ার আশ্চর্য নিন্দনীয় ভূমিকা আজকাল আমরা দেখতে পাই প্রতিনিয়ত। কেবলমাত্র ভোটের আগেই যে তার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা নয়। তা না হলে দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি এক নেতার রোজকার দিনলিপি ফলাও করে ছাপা বা সম্প্রচার হয় কেন বলতে পারেন? কিংবা সন্ত্রাসের কিংপিন বলে অভিযুক্তদের বক্তব্য বা চলাফেরার হালহকিকত কাগজের প্রথম পাতায় বা নিউজ চ্যানেলের হেডলাইনে বারংবার দেখানোটা সাংবাদিকতার কোন নীতিবোধ বা রুচিবোধের পরিণাম, সেটাই বলুন না 'স্টার' সাংবাদিকরা? ক্রমাগত প্রচারে 'ভিলেন' যে একদিন 'হিরো'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে খেয়াল কি রাখতে সক্ষম হন তাঁরা?

আজ বোধহয় প্রতিটি সচেতন ভোটদাতা জানেন এবং মানেন, একজন এমপি বা এমএলএ-কে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সংগঠন চালাতে গেলে বা ভোটে জিততে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সেই অর্থের বেশ বড় অংশ হিসাব বহির্ভূত থাকে, তা সে নির্বাচন কমিশন যতই নিয়মকানুন কড়া করুন না কেন। ঠিক তেমনই সেইসব মানুষের এ-ও অজানা নয়, বিরোধী ম্যাড়মেড়ে হলে ভোটের বাজারে মিডিয়াকে চূড়ান্ত বাণিজ্যিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ দুর্গা পুজোর মতোই ভোট পুজোতেও বাজারে বিশাল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়। অতএব বিরোধীদের শীতঘুম থেকে তুলে, গা গরম করিয়ে, ছন্নছাড়া থাকলে তাদের জোটবদ্ধ করে ময়দানে নামাতে হয় সেই মিডিয়াকেই। ব্যাস, ঠেলেঠুলে একবার গাড়িটাকে চালু করে দিলেই হল— এবার বিরোধী নেতৃবৃন্দ যতই গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচাবেন, কর্মীরা 'গ্যাস' খেয়ে যতই 'প্রতিরোধ' করতে এগিয়ে যাবে, ততই পোয়াবারো মিডিয়ার। দুমদাম বোমা, গুলি, জখম কর্মীর রক্তাক্ত থোবড়া বা নিথর লাশ

যত বাড়বে, মিডিয়ার বাণিজ্য ততই ফুলেফেঁপে উঠবে। সন্ধ্যায় বিতর্কসভার টিআরপি আকাশ ছুঁইছুঁই, বিজ্ঞাপন ধরাবার জায়গা নেই, কাগজ বিক্রির ঊর্ধ্বগামী গ্রাফ নিশ্চিন্ত করে মালিকপক্ষকে।

মারাত্মক ভুলটা বোধহয় এইখানেই হয়ে যায়। সাধারণ পাঠক বা দর্শকের সংবাদ ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেইসব মানুষ সত্যিই তাদের জুতোয় পা গলিয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখার সময় বা ধৈর্য কোনওটাই থাকে না মিডিয়ার, কারণ তখন তো আরবি ঘোড়ার সওয়ার হয়েছেন সাংবাদিকরা। পাঠকের বা দর্শকের মতামত জানার নিত্য মাপকাঠি যখন কেবলমাত্র কাগজের 'সার্কুলেশন' বা চ্যানেলের 'টিআরপি', তখন এই ভুল হয়ে চলবে আগাগোড়াই। ভবিষ্যদ্‌বাণী মিলে গেলে ছক্কা, না মিললেও 'অক্কা' নয়। মানুষের তো ভুলো মন, আর সেটাই তো ভরসা। জ্যোতি বসুর আমলে নির্বাচন কমিশন বা মিডিয়ার দাপট ছিল না, তাই সে হিসেব আলাদা থাক। কিন্তু খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, ২০০১-এ বাম-সরকারের বিরুদ্ধে এমনই ধারাবাহিক প্রচার চালিয়েছিল মিডিয়া। প্রচার এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, বাম-কর্মী ও নেতারাও ধন্দে পড়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন বিদায়ের কথা। কিন্তু ফল বেরলে বিরোধীদের আশায় ছাই দিয়ে, সব পূর্বাভাস নস্যাৎ করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ফিরে এলেন, তখন মিডিয়ার অজুহাত ছিল, মানুষ নাকি রাতারাতি সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেছে।

উত্তরবঙ্গের ছবিটা আরও বিপজ্জনক। কলকাতার মিডিয়ার চোখে উত্তরে এবারের বিধানসভায় যেমন মাত্র দুটোই 'স্টার' আসন— এক, শিলিগুড়ি, সৌজন্যে অশোক ভট্টাচার্য। আর দুই, দিনহাটা, সৌজন্যে উদয়ন গুহ। অতএব, তাঁদের মতে এই দুটোর জন্য কলকাতা থেকে সিনিয়র সাংবাদিক পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের কাছে বাকিগুলো সব 'এলেবেলে', স্থানীয় সাংবাদিকরাই সামলে দিতে পারবেন। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সাংবাদিকদের বৈশিষ্ট্য হল, এঁরা পার্ট টাইম সাংবাদিক। এঁদের বেশির ভাগেরই মূল পেশা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা, বাকিদের ভরসা স্থানীয় নেতাদের 'আনুকূল্য'। (কথিত আছে, কলকাতার বড় দৈনিকের কতিপয় উত্তরবঙ্গীয় সংবাদদাতা এইসব নেতার আনুকূল্যেই প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকুরিটুকু লাভ করিয়াছেন) অতএব স্থানীয় সংবাদদাতাদের পরিবেশিত নির্বাচনী বিশ্লেষণ কেমনধারা হবে তা অনুমান করা নিশ্চয়ই খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তাই পাঠক বা দর্শক যখন নিজের এলাকার নির্বাচনী বিশ্লেষণ পড়েন বা দেখেন বা শোনেন, তখন একবার হলেও হয়ত অবাক হন কিংবা হয়ত আঁতকে ওঠেন। কিন্তু মিডিয়ার তাতে কী এসে যায়?

আর ঠিক সেই কারণেই হয়ত মিডিয়া কারও সমালোচনা সইতে পারে না। দিল্লির নিউজ চ্যানেলের শীতল কাচের ঘরে বসে যে সুদর্শন মানুষটি অসাধারণ বাগ্মিতায় দেশের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছেন, জনপ্রিয় দেশাত্মবোধকে বিক্রি করছেন হট কেকের মতো, তিনিও যেমন মিডিয়ার বিরুদ্ধে সামান্য মন্তব্যে ঝাঁজিয়ে ওঠেন, একই রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন কলকাতার নিউজ চ্যানেলের জনপ্রিয় সুশোভনটিও, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তুলোধোনা করা যাঁর 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। এঁদের নিয়ে আওয়াজ তোলার রীতি বা ব্যবস্থা আমাদের গণতন্ত্রে নেই, টেলিভিশন রেটিংই এঁদের একমাত্র হাতিয়ার। কিংবা জিয়নকাঠিও বলতে পারেন।

উত্তরায়ণ সমাজদার

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, মাথাভাঙা, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা 'এখন ডুয়ার্স' নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে। **গ্রাহক নেওয়া শুরু হচ্ছে মে ১৫, ২০১৬ থেকে।** গ্রাহকদের পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া শুরু হবে জুলাই ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

যেখানে বারবার গলাধাক্কা খায় ইতিহাস

সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয় বক্সা দুর্গে। অথচ এর আগে বারবার লুণ্ঠিত, বছরের পর বছর অবহেলিত ইতিহাস এখানে লজ্জায় লুকিয়ে থাকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। আলিপুরদুয়ারের আবেগে সুড়সুড়ি দিতে এর আগে নিয়ম ভেঙে এই ঐতিহাসিক বন্দিনিবাস চত্বরে স্মারকস্তম্ভ, উদ্যান তৈরি হয়েছে। কিন্তু মূল সৌধটিকেই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা আজও জারি আছে।

গত ২৬ জুলাই ২০১৫-য় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের একদল বিশেষজ্ঞ রাজ্যের উত্তরবঙ্গ অংশের ঐতিহাসিক সৌধ বক্সা দুর্গ পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে বক্সা বন দপ্তরের আধিকারিক সহসাই চমকে ওঠেন। পুরাতাত্ত্বিকদের তা পর্যবেক্ষণ তো দূর অস্ত, দেখতে যাবার অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে আদেশ করেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের 'ডিউটি' পালন করতে পারেন কোতওয়াল বন দপ্তরকে এই মুচলেকা দিয়ে যে, 'তাঁরা ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের ভিতরে ঢুকবেন না, কেবলমাত্র বাইরে থেকে একটু দেখে চলে আসবেন!'

আশ্চর্য ঘটনা! ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক, একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, যা সর্বসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার তা দেখতে কেবল মানা পুরাতাত্ত্বিকদের। যেখানে ভারত তথা বিশ্বেও ঐতিহাসিক সৌধ বা স্থাপত্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত। এমনকি যেখানে ১১ মে ১৯৮১-তে এই বক্সা দুর্গকে রাজ্যের একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে under the West Bengal Preservation of Historical Monument and Objects and Excavation of Archaeological Sites Act, 1957 (W.B. Act XXX of 1957) এবং রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগে তা নথিভুক্ত (S-WB-69) করা হয়েছে।

তবে কি শেষে এই Historical Monument অর্থাৎ বক্সা দুর্গ বন দপ্তরের সম্পত্তি হয়ে উঠল? নাকি ইতিহাস ধামাচাপা দেবার জায়গিরদারি? তা না হলে ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের বাধা দেবার ক্ষমতাই বা কীভাবে অর্জন করলেন তাঁরা? নাকি এমন কিছু লুক্কায়িত বা দুর্গের ভিতর বন দপ্তর এমন কর্মকাণ্ড করছে, যা পুরাতত্ত্ব তথা ইতিহাস অবদলিত? বক্সা দুয়ারে পৌঁছেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের সামনে যাওয়ামাত্র একটা সাইনবোর্ড— জানা গেল, বক্সা দুর্গকে একটি নন্দন উদ্যানে পরিণত করা হচ্ছে, যার দায়িত্বে রয়েছে 'উদ্যান ও কানন বিভাগ, শিলিগুড়ি শাখা,

পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ।

হায় বক্সা দুর্গ, হায় ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিবিজড়িত অবহেলার বন্দিনিবাস!

বক্সা দুয়ারের এই দুর্গ প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল আগেই। রাজ্যের বাম-ডান সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের লাগাতার প্রচেষ্টায়। এবার কফিনের শেষ পেরেক পড়ল বর্তমান সরকারি পরিকল্পনায়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি বলা হয় যে, বক্সা দুর্গর তার ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবার উৎসব শুরু হয় নয়ের দশকেই—বিগত বাম-জমানায়। ভুল হবে না যদি বলি যে, ব্রিটিশ জমানার 'অত্যাচারের চিহ্ন'— এই বন্দিনিবাসকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা বহু আগের এবং এতে ভারত সরকারেরও মদত রয়েছে। যে কারণে আন্দামানের সেলুলার জেলকে ধ্বংস করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল, সেই একই কারণে বক্সা দুর্গ তথা বন্দিনিবাসকেও ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন, পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার তথা আপামর ডুয়ার্সবাসী বরাবরই বক্সা দুর্গকে নিয়ে ভীষণ আবেগতাড়িত। ইতিহাস তো প্রায় সবই অযত্নলালিত। তবু বক্সার এই দুর্গ ও বক্সা পাহাড়কে নিয়ে তাদের টান বহুকাল থেকেই। এর সঙ্গে যোগ হয় কিছু বামপন্থী ভাবধারার মানুষদের বক্সা জেলে এক সময় বন্দি থাকা। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আবেগে পরিণত হয় বক্সা দুয়ারের দুর্গকে ঘিরে।

অন্য দিকে এক ভুল ধারণায় প্রচলিত হয়ে একটি রাজনৈতিক দল, যারা সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী বলে পরিচিত—আবেগমথিত হয়ে ইতিহাসহীনভাবে ছুটে যেত মাঝে মাঝেই বক্সা দুর্গে। এবং পল্লবিত করত একটি ভুল তথ্য যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই দুর্গে বন্দি ছিলেন। কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী বক্সা বন্দিশিবিরে বন্দি কোনও ব্যক্তিকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা হেয় না করে আমি জানাতে চাই যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বক্সার জেলে বন্দি ছিলেন, বক্সা দুয়ারের দুর্গ বা বন্দিনিবাস বা ডিটেনশন ক্যাম্পে নয়। আবেগের সবিশেষ ইন্ধনে ইতিহাসকে বিকৃত বা ভুল পথে চালিত করবেন না। যা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে তা শোধরানো ভীষণ দরকার— না হলে ভবিষ্যৎ আমাদের ক্ষমা করবে না।

জানি না কেন হঠাৎ করে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে বক্সা দুর্গকে বক্সা বন্দিনিবাস আখ্যা দিতে উত্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন যে, পর্যটকরা বক্সা দুর্গকে সেনানিবাস থেকে বন্দিনিবাস হিসেবে বেশি গ্রহণ করবে আর দলে দলে বক্সা দুয়ারে আসবে। হয়ত তাই কোনও অমায়িক উদাসীনতায় তাঁরা এক কালের বক্সা দুর্গ যে ঐতিহাসিক কারণে 'সেনানিবাস' থেকে 'বন্দিনিবাস'-এ পরিণত হয়েছিল, সেই সূত্রবদ্ধ ইতিহাসকে ভুলে যেতে সাহায্য করলেন। ১৯৮৪ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে কীভাবে এই ঐতিহাসিক দুর্গ মানুষের আবেগ এবং অযাচিত ভুল পদক্ষেপে আজ ধ্বংসের শেষ সীমায়।

এই দুর্গ ধ্বংস করতে প্রথম হাতুড়ির আঘাত হানে ১৯৮০-র দশকে পূর্ত দপ্তর।

১৯৭৭-এ পূর্ত দপ্তরের এক আদেশনামায় বলীয়ান হয়ে কিছু ঠিকাদার ১৯৫৯-এর অস্থায়ী 'তিব্বতি উদ্‌বাস্তু শিবির' খুলে নেবার অজুহাতে লুটপাট এবং ভাঙচুর চালায়। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির ঠিকাদারদের লোকজন ভাঙচুর করে নিয়ে যায় দুর্গের ব্রিটিশ শাসনকালীন সময়ের সমস্ত চিহ্ন। এই লুটপাট উৎসাহ জোগায় এতদিনের প্রতিবেশী এবং ইতিহাসের ধারক, স্থানীয় পিতৃহীন বাসিন্দাদের। প্রায় সাবোটাজিং-এর মতো তারা সময় ও সুযোগমতো আজও বক্সা দুর্গের বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী চুরি করছে, যা ঐতিহাসিক। প্রতিবাদ করলে নির্দ্বিধায় জানায়, 'নিচের লোকরাই তো সব চুরি করেছে, আর আমাদের গ্রামের জিনিস আমরা নিলে অন্যায়?'— অকাট্য যুক্তি!

প্রায় এক দশক ধরে চলতে থাকা লুট ও চুরি ভগ্নপ্রায় বক্সা দুর্গকে বেমালুম গায়েব করে তোলে। আলিপুরদুয়ারের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি শঙ্কিত হন। যাঁরা বক্সা দুয়ারের পাহাড় ও দুর্গকে ভালবাসতেন, তাঁদেরই প্রচেষ্টায় দুর্গকে রক্ষা করবার জন্য গড়ে ওঠে এক 'সংগঠনী সমিতি' (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩)। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন জগন্নাথ বিশ্বাস। তাঁদের চেষ্টা ও কাজকর্মের ফলে নিঃসন্দেহে বক্সা দুয়ার প্রচারের আলোয় আসে, সচেতনতা গড়ে ওঠে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বক্সা দুর্গ, বন্দিনিবাস রক্ষা পায় যেন আপাত ধ্বংসের মুখ থেকে। বটের ঝুড়ি, ইতিহাস ঢাকা ঝোপ আর জংলা লতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ঘুম দেয় সে পরম শান্তিতে!

কিন্তু হঠাৎই এক ঘোষণায় ইতিহাসের এই দুর্গের ঘুম ছুটে যায়। সমিতি ঘোষণা করে যে, বক্সায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে তৈরি হবে এক স্মারকস্তম্ভ, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে ১৯৮৫-র স্বাধীনতা দিবসে। আতঙ্কে দিন কাটে সৌধের। কবে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত আসবে। ইতিমধ্যেই কামারশালায় সেই বিশাল হাতুড়ির দরদাম সেরে ফেলেছেন বিশিষ্টজনরা। স্মারকস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর ততক্ষণে স্থাপন হয়ে গিয়েছে। আর তা হয়েছে ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গের ভিতরেই।

জানি না, এই সমিতির উদ্যোগীরা কি জানতেন না যে, বক্সা দুর্গ আগেই (১৯৮১ পর্যন্ত) রাজ্য সরকারের একটি ঘোষিত ঐতিহাসিক সৌধ, যার ভিতরে বা চৌহদ্দিতে কোনওরকম নির্মাণকাজ, সংস্কার বা পরিবর্তন আইনবিরুদ্ধ? কিন্তু শুধু কি তারাই? হায় রাজনীতি! সাধারণের আবেগ থেকে ফায়দা তোলার কারণে তৎকালীন রাজনীতিবিদ-শাসক-মন্ত্রীরা হুটোপুটি

লাগিয়ে দিলেন। কীভাবে আরও দ্রুত মাটির সঙ্গে তা মিশিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য! অবশেষে ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭, সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সফলভাবে এক অদ্ভুতদর্শন কংক্রিট শিবলিঙ্গের মতো স্মারকস্তম্ভ উদ্‌বোধন করা হল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দিয়ে। কিন্তু উদ্‌বোধনী ফলকে নাম থাকল অনুপস্থিত তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর আর গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল বন মন্ত্রী যোগেশ বর্মনের!

দুর্গের ভিতরে নতুন স্মারকস্তম্ভ বসিয়ে নেতা এবং বিশিষ্টরা যেন ঘোষণা করলেন, 'আজ এইখানে গর্বের সঙ্গে ইতিহাস ও স্বাধীনতার প্রতীককে ধূলিসাৎ করা হল। পাহাড়ের আদি বাসিন্দা ডুকপারা কিন্তু আর্তনাদ করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, কী লাভ হল বক্সা দুয়ারের ইতিহাসের? হ্যাঁ, লাভ একটা হয়েছিল বটে। আলিপুরদুয়ারের ঠিকাদারদের পকেটে প্রচুর ঢুকেছিল। আর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ভোটবাক্সে বন্দি করতে পেরেছিলেন স্বাধীনতার আবেগকে।

তবে সংগঠনী সমিতির বরাত দেওয়া হাতুড়ি যখন বক্সা দুর্গে গজাল পুঁতে ইতিহাসের আদি-অকৃত্রিম ভিত ধ্বংস করতে ব্যস্ত, নেতা, সমাজকর্মী, সরকারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সমিতির সম্পাদক জগন্নাথবাবুরা তখন কিন্তু আমন্ত্রিত হননি! তাঁরা হয়ত তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। সে কারণেই হয়ত অনুপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অর্ণব সেন বা অনুপম তালুকদারের মতো ব্যক্তিরা। হয়ত তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার এই স্মারক বক্সা দুয়ারের মানুষদের তথা বক্সা দুর্গের কোনও উপকারে লাগল না। 'মিডলম্যান' কিছু দালাল, নেতা ও ঠিকাদাররা পকেট ভরতি করল। কিছু লোক এই কাণ্ডকে ভাঙিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার নামে সস্তা নাম আর রোজগারে নেমে পড়ল। সেই কারণে দেখা যায় যে, 'মেঘের গায়ে জেলখানা' সংকলন-সম্পাদক মহাশয় ঐতিহাসিক সৌধের ঘোষণায় যে আইনের ধারাটি WB ACT XXI of 1957 উল্লেখ করেছেন তা ভুল। উল্লিখিত ধারাটি লটারি এবং গ্যাম্বলিং অ্যাক্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত— ইতিহাসের সঙ্গে নয়। আবার এক বক্সাপ্রেমী, ভাষা-গবেষক এই সংকলনে বক্সা দুয়ারের উন্নয়নের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে দুর্গ বা ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য একটি শব্দও খরচ করেননি।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ইতিহাস উপেক্ষা করে জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তৎকালীন সরকার যেখানে কফিনের প্রথম পেরেকটি পুঁতলেন, সেখানে এক সময় একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। তাতে শাবদ্রুং রিম্পচির বক্সা দুর্গ যখন ভুটানি জং বা দুর্গ ছিল, সেই সময়কালের তাম্রমূর্তি ছিল। যার ছিল, সেই সময়েই ওই বেআইনি কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ২০০৩-৪ সালে আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন মহকুমাশাসকের উৎসাহ ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে বক্সা দুয়ারের পুরাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা প্রমাণিত হয়। সুখের বিষয়, গুম্ফার সেই তাম্রমূর্তিটি আজও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সযত্নে রক্ষিত।

কারা দপ্তরের প্রস্তাবটি হল, বক্সা কারাগারে বন্দি প্রায় ৩০০ স্বাধীনতা সংগ্রামীর মহান ভূমিকাকে স্মরণ করে আরও একটি স্মৃতিস্মারক তাঁদের অর্থানুকূল্যে নির্মাণ করবে বক্সা দুর্গের ভিতর। সৌভাগ্যবশত এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। আশা করা যায়, বিগত সরকারের ওই প্রস্তাব নতুন সরকার অবশ্যই পালন করবে না। কিন্তু তাতেও ভাববেন না, এই ঐতিহাসিক দুর্গটির বিপদ কেটেছে। জানি না কেন সস্তায় বাজিমাত আর মানুষের আবেগকে মূলধন করতে বারবার আঘাত হানা হয় এই দুর্গে।

সে দিন কিন্তু রাজ্য সরকার তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ওই স্মারকস্তম্ভই শুধু গেড়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ১৯৯১-এ পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে বক্সা দুয়ারের উন্নতিকল্পে একটি কমিটি গড়া হয়, যার মধ্যে বন দপ্তরের আধিকারিক প্রণবেশ সান্যালকে রাখা হয়। এই কমিটি ১৭ জুলাই ১৯৯৮-এ তাঁদের দেওয়া রিপোর্টে বক্সা দুর্গে আবার আঘাত হানার প্রস্তাব দেয়। তাঁরা বক্সা দুর্গের স্পেশাল রিপেয়ারের জন্য ধার্য করেন ৩,৩৮,০০৪ টাকা এবং মান্যতা দেন কারা দপ্তরের একটি প্রস্তাবকে। কারা দপ্তরের প্রস্তাবটি হল, বক্সা কারাগারে বন্দি প্রায় ৩০০ স্বাধীনতা সংগ্রামীর মহান ভূমিকাকে স্মরণ করে আরও একটি স্মৃতি স্মারক তাঁদের অর্থানুকূল্যে নির্মাণ করবে বক্সা দুর্গের ভিতর। সৌভাগ্যবশত এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। আশা করা যায়, বিগত সরকারের ওই প্রস্তাব নতুন সরকার অবশ্যই পালন করবেন না। কিন্তু তাতেও ভাববেন না, এই ঐতিহাসিক দুর্গটির বিপদ কেটেছে। জানি না কেন সস্তায় বাজিমাত আর মানুষের আবেগকে মূলধন করতে বারবার আঘাত হানা হয় এই দুর্গে।

১৯৯৭-এর হুল্লোড়ের পর বক্সা দুর্গ তার ভগ্নদশায় ফিরে যায়। আগাছা আর জঙ্গল ঘিরে ধরে ধ্বংসাবশেষকে। আর উৎসাহী পর্যটকরা ৫ কিমি হেঁটে উঠে এসে এই ভগ্নদশা দেখে আর শিক্ষিত গাইডের অভাবে দুর্গের ইতিহাস ও তার গরিমাকে বুঝতে না পেরে হতাশ হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

প্রকৃতি নিজের মতো করেই দুর্গটিকে সুরক্ষিত রেখেছিল। কিন্তু হঠাৎই আবার দু'বছর আগে দেখা গেল, দুর্গের প্রবেশপথকে আড়াল করে তার গায়ে গা লাগিয়ে নতুন এক নির্মাণকার্য চলছে। কী? না, এবার বাম, ডান নয়— গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ডুয়ার্সের প্রতিনিধির মনে হয়েছে, বক্সা দুয়ারে একটি মঞ্চ তৈরি করবেন। ভাল কথা। প্রতিনিধি মহাশয়কে বোঝানো হল যে, 'কোনও ঐতিহাসিক সৌধের এলাকায় আপনি নতুন কোনও নির্মাণকার্য করতে পারেন না। দুর্গের মাঠের অপর পাশে জায়গা রয়েছে, সেখানে করতে পারেন। ধন্যবাদ উইলসন চম্প্রমারি মহাশয়কে। তিনি বুঝলেন এবং বক্সা দুয়ার একটি রঙ্গমঞ্চ পেল, দুর্গের ক্ষতি না করেই। সরকার ও তার উৎসাহী বিশিষ্টজন, সমাজসেবী, প্রকৃতিপ্রেমী, সর্বোপরি বক্সাপ্রেমীরা বোঝেননি যে বক্সা দুর্গের সংরক্ষণ জরুরি। বন্দিনিবাসকে মর্যাদা দিতে গেলে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব বিভাগকে দায়িত্ব দিতে হবে। তাঁরা দুর্গের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এর নিহিত ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করতে পারবেন। তবেই না বক্সা দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠবে পর্যটকের ঢল।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ২০০৭ সালে রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগকে আমার মাধ্যমে 'Study Report on the Conversation and Restoration of the Buxa Fort' নামে একটি রিপোর্টও জমা দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে। তাঁরা উৎসাহিতও হন বক্সা দুর্গের ভার নেবার জন্য। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ রয়েছে এই দুর্গের Protection বা Conservation ও Preservation-এর আর্থিক দায়ভারের জন্য। কিন্তু আমরা কেবল পর্যটকদের ঠকিয়ে আকর্ষিত করবার জন্য বক্সা দুর্গকে ছিঁড়েখুঁড়ে তার ঐতিহাসিক গৌরবকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি।

বন দপ্তর উদ্যান বানাচ্ছেন দুর্গের ঘাড়ের উপর। দুর্গের মূল অংশে খোঁড়াখুঁড়ি

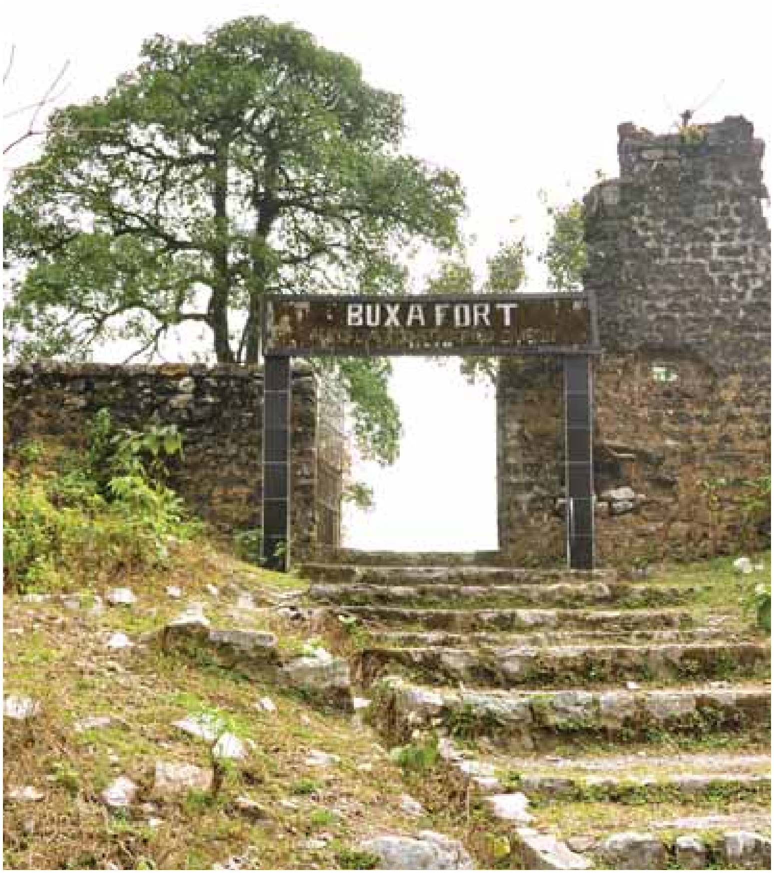

করা হয়েছে লোহার বেঞ্চ, সিমেন্টের বেঞ্চ, দোলনা ইত্যাদি বসাতে। দুর্গের উত্তর-পূর্বের অর্থাৎ আধুনিক স্মারকস্তম্ভের পাশের দেয়ালটির বাকি অংশও ভেঙে ফেলা হয়েছে। কেন? ভ্রমণপিপাসুরা স্মারকস্তম্ভের পাশের চেয়ারে বসে ঝালমুড়ি, থুড়ি মোমো, চিপস, কোক খাবেন— আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মেতে উঠবেন 'বাহ্! বাহ্!' তুমুল ধ্বনিতে। আর দুর্গের ওই অবশিষ্ট দেয়ালটা যে পাহাড়ের ওই উন্মুক্ত দৃশ্যকেই আড়াল করছিল, তাই সরানো হয়েছে।

উইলসন চম্প্রমারি মশাই যেখান থেকে তাঁর মঞ্চটি সরিয়েছিলেন, তার পাশে মূল প্রবেশপথে একটি দোতলা ঘর বানানো হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, দুর্গের ভিতর উদ্যান ফুটিয়ে তুলতে সুপারি গাছ পুঁতেছে বন দপ্তর। অতএব খামতি আর কী রইল ঐতিহাসিক এই দুর্গটির ইতিহাসকে ঘাড়ধাক্কা দিতে? আসলে সব সরকারই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ব্রিটিশদের অত্যাচারের স্মৃতি রাখব না। ইতিহাসের কালপঞ্জি বাতিল। দুর্গটিতে পর্যটকদের জন্য এখন উদ্যান হোক, পরে বেসরকারি ব্যবস্থায় পাঁচতারা হোটেল— তাই ইহা আজ বক্সা প্রমোদকানন!

তমাল গোস্বামী

ছবি: ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

কবিগুরুর শহর শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নানা অনুষঙ্গ। লাল পলাশ উপচে পড়া গাছেদের সারি আর নিস্তরঙ্গ খোয়াইকে সঙ্গে নিয়ে জেগে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়-শহর। বছরভর নানা উৎসব এসে রাঙিয়ে দিয়ে যায় শান্তিনিকেতনকে, তখন বাউলদের মন উদাস করা সুরে সুর মেলাতেই তার বেলা যে যায়।

EXPERIENCE Bengal

THE SWEETEST PART OF INDIA

DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb www.twitter.com/TourismBengal (033) 2243 6440, 2248 8271

সাংসদের গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রকট হল উত্তরবাংলার চিকিৎসাব্যবস্থার হাল

দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা হলেও তিনি উত্তরবাংলার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত সাংসদ। অনেকটা যেন মোগল আমলের মনসবদারি প্রথার মতোই উত্তরবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া— সব কিছুকে দিল্লির দরবারে পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তা পালন করার জন্য কলকাতার বাসভূমি ছেড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে মাঝেমধ্যে আসার কষ্ট হাসিমুখে মেনে নেন। রাজধানীর শাসকরা এই জেলার স্থানীয় নেতা, কর্মী ও এই জেলার মাটির গন্ধ চেনাজানা ব্যক্তিত্বদের থেকে তাঁকেই এই এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তাই বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীপদে দলের মনোনয়ন দিয়েছিলেন। আর তিনিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে এই কেন্দ্রে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একাধারে প্রবল সিপিএম বিরোধী ঝড় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা রথে নির্বাচিত হয়ে সংসদের আসন অলংকৃত করেছেন।

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে দুর্ভাগ্যবশত তাঁর গাড়ি এক দুর্ঘটনায় পড়ে। ওই দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর হন। আহত হয়ে বালুরঘাটে বিপুলভাবে ঘোষিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। ওই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উদ্‌বোধনের দিন স্থানীয় সাংসদ হিসেবে তিনি শুধু উপস্থিতিই ছিলেন না, ওই হাসপাতালটির জন্য তিনি তাঁর অবদানের কথাও ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, গঙ্গারামপুরে ও বালুরঘাটে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ কলকাতার ক্ষুদিরাম মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ দু'টি ঝাঁ চকচকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উপহার দিয়েছেন। ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে সাংসদ অর্পিতা ঘোষ তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দাবি করেছিলেন, এই অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, বালুরঘাটে ১০২ কোটি টাকা এবং গঙ্গারামপুরে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হয়েছে। এই দু'টি অত্যাধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রতিটি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ সব ধরনের জটিল চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখন থেকে আর উত্তরবাংলার এই প্রান্ত জেলা দু'টির মানুষকে কলকাতা বা দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার জন্য ছুটতে হবে না। রায়গঞ্জে এইমস ধাঁচের প্রস্তাবিত হাসপাতালটি কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ছিল, এতে নিশ্চয়ই প্রশমিত হবে।

ঝাঁ চকচকে চোখ ধাঁধানো সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে সোনার পাথরবাটির আসল চেহারাটা যে এমনভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে, তা এই দুর্ঘটনায় সাংসদ অর্পিতা ঘোষ আহত না হলে জানা যেত না। এই দু'টি ভবনই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের শাসকদের প্রচারের ঢাক হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

সাংসদ অর্পিতা ঘোষ দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে ভরতি হয়েছিলেন বালুরঘাটের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কেবিনে। অর্পিতা শাসকদলের সাংসদ। ফলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সর্বাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা যে তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল— এতে কোনও সন্দেহ নেই।

দুর্ঘটনায় সাংসদ অর্পিতা ঘোষের হাত ও পায়ের হাড়ে ভাঙন ধরা পড়েছিল। অর্থাৎ তাঁর চিকিৎসা অস্থি-শল্য বিশেষজ্ঞর চিকিৎসার ব্যাপার। সাধারণভাবেই এই শল্যচিকিৎসা বড় হাসপাতালে সাফল্যের সঙ্গেই হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে অস্থি-শল্য চিকিৎসক ছিল না। থাকলেও সেই চিকিৎসার উপর ভরসা করা যায়নি। তাই সাংসদকে নিয়ে যেতে হয় বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতায়। সেখানেও কিন্তু ভরসা করতে পারলেন না কোনও সরকারি হাসপাতালের উপর। ভরতি হলেন দামি প্রাইভেট নার্সিং হোমে। স্বস্তির খবর, সাংসদ অর্পিতা ঘোষ দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু সাংসদ দুর্ঘটনার কবলে না পড়লে সে কথা কেউ বললে তাকে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া হত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন, স্বাধীনতালাভের ৬৯ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও রাজ্যের এই উত্তর ভাগের মানুষ যে এখনও বঞ্চিত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে, এই ঘটনা কি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না? যত দূর জানা আছে, সাংসদ অর্পিতা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল এবং রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় তাঁর বসবাসেরও সুযোগ আছে। কিন্তু প্রান্ত দুই দিনাজপুর জেলাসহ উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের তো কলকাতায় গিয়ে এভাবে চিকিৎসা করার সুযোগ নেই। তারা কীভাবে চিকিৎসার সুযোগ পাবে? তা ছাড়া তারা কেন তাদের জেলায় চিকিৎসার সুযোগ পাবে না? কেন ছুটতে হবে রাজধানীর ভিড়ের স্রোতে হাবুডুবু খেতে? উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ আছে। কলকাতার চিকিৎসকরা এখানে বদলি হয়ে আসেন। তবু তাঁরা দিনের পর দিন কলকাতায় তাঁদের প্রাইভেট নার্সিং হোমে রোগী দেখার ব্যবসায় যুক্ত থাকেন। মাঝেমধ্যে বেড়াতে যাবার মতো উত্তরবঙ্গে বুড়ি ছুঁয়ে আবার রাজধানীর নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যান। এই খবর স্থানীয় সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাঁদের কিছু যায়-আসে না। বিশেষ করে যাদের এই কৌশলযাত্রার নৌকায় শক্তিশালী মাঝি দাঁড় বয়, তাদের কোনও সমালোচনার ঝড়ই নৌকাকে ডোবাতে পারে না।

আজ এই প্রশ্ন কিন্তু অনেকে ভাবতে শুরু করেছে। দেশীয় জনবিন্যাস তথা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবনায় উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটা মানসিক বিভাজন কিন্তু স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উত্তর ভারতে বিশেষ করে হিন্দি বলয়ে যে রাজনৈতিক হাওয়া বইতে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ভারতে তার বিপরীত রাজনৈতিক হাওয়া চলে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধি-সহ কংগ্রেস যখন প্রায়

একেবারে মাটিতে শয্যা নিয়েছিল, তখন দক্ষিণ ভারতে দেখা গেল কংগ্রেসের জয়জয়কার। আবার এর বিপরীত ছবিও আছে। দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা ইত্যাদির মতো রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটলে উত্তর ভারতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের বিজয়রথ। উত্তরে হিন্দি ভাষার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান বারবার দক্ষিণ ভারতের শক্ত গ্রানাইট পাথরে বাধা পেয়ে আসছে।

পশ্চিমবাংলা স্বাধীনতার দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে পুববাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে এক শক্তিশালী সংগঠিত রাজ্য রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার এই পশ্চিমবাংলার বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার প্রবাহ দক্ষিণ ও উত্তর— এই ভৌগোলিক বিভাজনের সীমা টেনেছে। এই দুই খণ্ডের মধ্যে কেমন একটা মানসিক বিভাজনের রেখা যেন গভীর হচ্ছে। আমরা উত্তরবঙ্গের, ওরা দক্ষিণবঙ্গের— এমন একটা মানসিক বিভাজন ক্রমশ যেন মনের মধ্যে চেপে বসতে চাইছে। এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না দিলে এই মানসিক বিভাজন যে তেলেঙ্গানার তেলুগু এবং উপকূল অন্ধ্রের তেলুগু বিভাজনের মতো কোনও জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণি তৈরি করবে না এমন নিশ্চয়তা কিন্তু দেওয়া যায় না।

একটা অভিমান কোচবিহারের তোর্সা থেকে মালদার গঙ্গার পাড় পর্যন্ত বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। পশ্চিমবঙ্গ বলতে কি শুধু গঙ্গার পাড়ের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুরের মতো জেলাকেই বোঝাবে? উত্তরবাংলার অহল্যাভূমিতে স্বাধীনতার ৬৯ বছরের মধ্যেও কেন কোনও এক রামের পাদস্পর্শে শিল্পবন্ধ্যার ছবিটির পরিবর্তন ঘটল না?

প্রান্ত দুই দিনাজপুর জেলাসহ উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের তো কলকাতায় গিয়ে এভাবে চিকিৎসা করানোর সুযোগ নেই। তারা কীভাবে চিকিৎসার সুযোগ পাবে? তা ছাড়া তারা কেন তাদের জেলায় চিকিৎসার সুযোগ পাবে না? কেন ছুটতে হবে রাজধানীর ভিড়ের স্রোতে হাবুডুবু খেতে?

এটা ঠিক, সমগ্র রাজ্য জুড়েই চলছে শিল্পের খরা। শিল্প জেলা বলে পরিচিত রাজ্যের জেলাগুলির শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ। চিমনিতে ধোঁয়া নেই, তবু মাঝেমধ্যে রাজ্যের শিল্পের মরা গাঙে বান ডাকার ইঙ্গিত দিয়ে শিল্প প্রকল্পের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সেই আশ্বাসের মানচিত্রে তো উত্তরবাংলার কোনও জেলার ঠাঁই নেই। এ কথা ভাবার কোনও জায়গা নেই, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মানুষ সবাই দুধে-ভাতে থাকে আর উত্তরবাংলার মানুষ অনাহারে দিন কাটায়। কিন্তু সংসারে পিতামাতা যা খুদকুঁড়ো সংগ্রহ করে তা সব সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন না করে, যদি কোনও একজন বা দু'জনের মধ্যে বণ্টন করে, বাকি সন্তানদের তার থেকে কোনও অংশ দিতে না চায়, তবে সেটা কিন্তু অন্য সন্তানদের চোখে বঞ্চনা বলেই মনে হবে। আর সেই বঞ্চনা এক সময় ক্ষোভ ও অভিমানে পরিণত হয়ে সংসার থেকে পৃথক হতে প্ররোচিত করবে।

স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল দু'টি রাজ্য পাঞ্জাব ও বাংলাকে তাদের দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে। স্বাধীনতার পর পাঞ্জাব তার রাজ্যকে পুনর্গঠিত করেছিল তার সম্পদকে রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতে ভাগ করে দিয়ে। লাহোরকে হারিয়ে পাঞ্জাব কিন্তু তার সমস্ত সম্পদকে বৃহত্তম শহর লুধিয়ানায় শ্রেণিভুক্ত করে এককেন্দ্রিক রাজ্য গড়ে তোলেনি। শিল্পকেন্দ্র অন্যত্র গড়ে তুলেছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গ হয়ে থাকল এককেন্দ্রিক রাজ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক— সর্বত্রই শেষ কথা কলকাতা কি বলে?

রাজধানীর গুরুত্ব সব দেশেই থাকে। কিন্তু সম্পদ বলতে যা কিছু, তার বণ্টনের ভাগ যদি রাজ্যের প্রান্তিক জেলার জন্য বরাদ্দ না করা হয়, তবে তো কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমবেই। সেই বিক্ষোভই ধীরে ধীরে সিঞ্চন হবে বিচ্ছিন্নতার কর্ষণভূমিতে। উত্তরবাংলার শিল্পহীন অহল্যাভূমিতে বৃহৎ শিল্পের কোনও প্রাণস্পন্দন নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও তো সরকারের একই বৈষম্য। সরকারি তথ্যে দেখা যায়, এই রাজ্যে শিল্প নিগম ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যে অনুদান দিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ভাগ্যে জুটেছে তার মাত্র পাঁচ শতাংশ। প্রশ্নটা তাই ওঠে— সাংসদ অর্পিতা ঘোষ চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাবার সুযোগ পান, কিন্তু উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়?

সৌমেন নাগ

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ

কাঁটাতারের কিস্‌সা কহানি

কাঁটাতার ভারী বুট অটো এমএমজি-র সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়েও সীমান্ত পেরিয়ে যায় মানুষ আর মালপত্র। পারাপারের রীতিনীতি মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটা, মালপত্রের ক্ষেত্রে অন্যরকম। পুরনো খবরের কাগজ থেকে শুরু করে প্রায় লুপ্ত ক্যাসেটের ফিতে ধরেও পাচার হয় টাকার বান্ডিল, কাশির ওষুধ ইত্যাদি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পারাপারের বিচিত্র গল্পগাছাই হল কাঁটাতারের কিস্‌সা কহানি।

এপার-ওপার মিলেমিশে একাকার

১

২০১১-র গোড়া থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর নিয়মিত কোচবিহার জেলার শীতলকুচি, সিতাই, নয়াবাজার এলাকায় যেতে হত। গোটা ডুয়ার্সের রাস্তা তখন বেশ খারাপ। মাথাভাঙা হয়ে কোচবিহার যাওয়ার রাস্তা আরও খারাপ। সীমান্ত-ঘেঁষা পকেট এলাকা শীতলকুচি এবং সেখান থেকে সিতাই যাওয়ার রাস্তা খারাপ সর্বোচ্চ দশায়। ফুট ছয়েক চওড়া পিচের রাস্তা একটা বানিয়েছিল কেউ, তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট তখন। ২০১৩ নাগাদ অবশ্য দ্বিগুণ চওড়া একটা রাস্তা মাথাভাঙা থেকে সিতাই পর্যন্ত নতুন করে তৈরি হয়েছিল। চাংড়াবান্ধা-ময়নাগুড়ি সার্ক রোডও শেষ হয় ওই সময়েই। ফলে শিলিগুড়ি থেকে সিতাই, অর্থাৎ প্রায় ১৬০ কিলোমিটার রাস্তা তখন সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই যাওয়া-আসা করা যাচ্ছিল। তার আগে লাগত সাত-আট ঘণ্টা।

আমি কোনও কাজে সেখানে যেতাম না। চাকরিসূত্রে আমার স্ত্রী ওই এলাকায় থাকতেন বলে মাসে দু'বার করে হানা দিতাম দু'-তিন দিনের জন্য। টিভি দেখার বিশেষ অভ্যেস নেই। ইন্টারনেটের গতিও শ্লথ। বইপত্তর নিয়ে গেলেও কাহাঁতক আর ঘরের ভিতর এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে একা একা কাটানো যায়! তাই দু'-তিন মাস যাওয়ার পর আমার ঘোরাঘুরি শুরু হল।

জলপাইগুড়ি জেলার যেসব এলাকা সীমান্তবর্তী, তার বেশ কিছু অংশ একদা বেশ ঘোরাঘুরি করেছি। তখন কে জানি বলেছিল যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মূল গপ্পটা সবখানেই আসলে এক। যে যে পয়েন্ট দিয়ে সরকারিভাবে পাসপোর্ট-ভিসা-সহ লোক আর মাল পারাপার হয়, সেখানে একটু অন্যরকম ব্যাপার থাকলেও বাকিটা একটাই ছাঁচে ঢালাই করা। প্রায় সাড়ে তিন বছর কোচবিহার জেলার উক্ত সীমান্ত এলাকা টুকটাক ঘুরে বেড়ানোর পর উপলব্ধি করলাম যে, কথাটা খুব সত্যি।

শীতলকুচির কাছাকাছি ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে সিতাই, কিছুটা পূর্বে কইমারি— সীমান্তের বর্ডার রোড লাগোয়া এই গ্রামগুলির জীবনযাত্রার সঙ্গে জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ি সীমান্তের গ্রামজীবনের পার্থক্য কী? আবহাওয়া আর ভূপ্রকৃতি বাদ দিলে রাজ্যের পুব বরাবর বয়ে যাওয়া সীমান্ত লাগোয়া বাকি কয়েকশো গ্রামের জনজীবনের ছন্দও কি আলাদা? সবটা চোখে দেখিনি। কিন্তু অনুমান করতে পারি, তফাত বিশেষ নেই। চোরাচালানের দল আর 'সীমা সুরক্ষা বল' আসলে সীমান্তের প্রতিটি বিন্দুতে একটাই সূত্রে আবদ্ধ। মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

বাড়িতে সাত-আটটা দৈনিক সংবাদপত্র রাখার কারণে দু'-তিন মাস পরপর বেশ ভাল পরিমাণ কাগজ জমে যায় এবং লোক এসে কেজি দরে সেসব কিনে নিয়ে যায়। বছর সাতেক আগের কথা। পুরনো কাগজের স্তূপ প্রায় সাত-আট ফুটের কাছাকাছি উঁচু। অথচ যারা কিনতে আসে, তাদের কারও পাত্তা নেই। একদিন ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। জানলা দিয়ে হঠাৎ শুনি, 'ভাঙাচোরা জিনিস-কাগজপত্তর-পুরনো বইখাতা বিক্রিইইই' উচ্চারণ করতে করতে কে জানি যাচ্ছে। তাকে বাড়ির ভিতরে ডেকে এনে বললাম, 'খবরের কাগজ আছে।'

'কতটা?'

দেখালাম। স্পষ্ট দেখলাম, কাগজের পরিমাণ দেখে তার চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'ক'দিনের কাগজ দাদা?' সে জানতে চাইল। আমি 'তিন মাস' বলাতে উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গেল।

'আমাকে দেবেন। আর কাউকে না। আমি বেশি দাম দেব।'

তখন আট টাকার মতো কেজিতে পাওয়া যেত। আমি দশ টাকা দর আশা করে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সে বলল, 'পঁচিশ টাকা।'

অনেকদিন পরে বেশ অবাক হয়ে মিনিটখানেকের জন্য মূক হয়ে রইলাম। ছেলেটি ইতিমধ্যে কাগজের স্তূপ খালি করতে শুরু করেছে। কাগজ জমেছিল একত্রিশ কেজির একটু বেশি। আমি বত্রিশ কেজির টাকা পেয়ে ভাবতে শুরু করলাম যে, রহস্যটা কোথায়!

পরের বার ছেলেটাকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল, তার বাড়ি কুকুরজানের কাছে সাতখামারে। বর্ডার এলাকা। সেখানে খবরের কাগজের খুব চাহিদা, কারণ কাগজে মুড়ে কাশির সিরাপের বোতল, গাঁজার প্যাকেট, নেশার ট্যাবলেট এবং আরও কিছু দ্রব্য ওপারে ছুড়ে দেওয়া হয়। শব্দ কম হয়। ইদানীং বর্ডারে একটু কড়াকড়ি থাকায় এই পদ্ধতিতে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা কাজ চালাচ্ছে। সে টাউন থেকে কাগজ কিনে নিজের গ্রামে চালানকারীদের কাছে বিক্রি করে। বেশি কাগজ পেলে দাম বাড়ে। একসঙ্গে পঁচিশ-তিরিশ কেজি কাগজ পেলে নাকি বারো-তেরোশো টাকায় নিয়ে যায়!

শুনে আমার মনে পড়ে গেল সাতাশ-আটাশ বছর আগে খইরুলের সঙ্গে প্রথম সীমান্ত দেখতে যাওয়ার কাহিনি।

২

খইরুলের সঙ্গে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে আলাপ। তার বাড়ি থেকে বর্ডার দেখা যায়। তার আগে আমি কখনও সীমান্ত দেখিনি।

খইরুল তা-ই শুনে বলেছিল, 'যে দিন যাবি, তার আগের দিন বলিস। স্কুটার নিয়ে আসব।' দিন ঠিক হল একটা। টাউনের কোনও এক আত্মীয়র স্কুটার নিয়ে খইরুল আমাকে পিছনে চাপিয়ে রওনা দিল তার গ্রামের দিকে। গ্রামের বাজারে তাদের ওষুধের দোকান। সেখানে কিছু ওষুধ আর হাতুড়ে ডাক্তার থাকে। জায়গাটার নাম বলব না। কারণ খইরুল এখনও সেখানেই থাকে এবং সে প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সূত্র হিসেবে বলতে পারি, কাছাকাছি 'যমুনা সেতু' বলে একটা ছোট ব্রিজ আছে সীমানা বরাবর।

জলপাইগুড়ির হোলসেলার আর ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে খইরুল সপ্তাহে একদিন ওষুধ কিনত। স্কুটারে দুই ব্যাগ ভরতি ওষুধ ছিল সে দিন। গ্রামের বাড়িতে সে যখন ব্যাগ থেকে সব বার করে এক কোণে সাজিয়ে রাখল, তখন আবিষ্কার করল যে, প্রায় সওয়া ব্যাগ বোঝাই কেবল ফেন্সিডিল-এর শিশি। সেকালে টাউনে কাশির ওষুধ চাইলে দোকানদার ওটাই বেশি দিত। ডুয়ার্সে তখনও নেশার উপকরণ হিসেবে কাফ সিরাপ জনপ্রিয় হয়নি।

খইরুল জানাল, বাংলাদেশে কাফ সিরাপের দারুণ চাহিদা। সেখান থেকে লোক এসে দু'-একদিনে বোতলগুলো নিয়ে যাবে। বিনিময়ে খইরুল পাবে সুতির উৎকৃষ্ট কাপড়, ইলিশ মাছ, লুঙ্গি, অস্ট্রেলিয়ার দুধ। আটের দশকের শেষ দিকের সে সময়টা ছিল সীমান্ত চালানের স্বর্ণযুগ। কাঁটাতার বসেনি। সংবাদমাধ্যমের বাড়াবাড়ি নেই। বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত র‍্যাশন কার্ড দিয়ে ভোটের তালিকায় নাম তুলিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। ডুয়ার্সে রোজই জনসংখ্যা বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে খইরুল আমাকে হাঁটাপথে একটু ঝোপজঙ্গলে ঘেরা একটা জমিতে নিয়ে এসে যখন বলল, 'ওই পিলারটার পর থেকেই বাংলাদেশ', তখন অবশ্যি আমি দেশান্তরের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাইনি। বিএসএফ বা বিডিআর কিছুই দেখা গেল না। খইরুল বলল, বিএসএফ নজর রাখছে। আমি না থাকলে সে পিলারের ওপারে চলে যেতে পারত। অচেনা লোক দেখলে বিএসএফ দৌড়ে আসবে।

তারপর বলল, 'বাংলাদেশে গেলে থাকতে হবে। রাতে নিয়ে যাব।'

চোরাচালান বিষয়টা সীমান্তবাসীর কাছে কোনও অপরাধ নয়। বিএসএফ তাদের কাছে আদৌ শ্রদ্ধার কোনও পাত্রই নয়। সে দিন খইরুলের স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে প্রথম অনুভব করেছিলাম কথাটা। গোরু পাচার নিয়ে সে সময় তেমন কিছু শোনা যেত না। কাঁটাতার না থাকায় গোরুদের পার করাতেও কষ্ট ছিল না বিশেষ।

বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বিএসএফ না হয় হল, বিডিআর ধরে না?'

৩

২০১১-র মে মাসের গরম। ভ্যান রিকশা চেপে সিতাইয়ের পুব দিকে কৈখালি গ্রামের দিকে যাচ্ছি। সীমান্তে ঘোরাঘুরি করতে গেলে একজন স্থানীয় মানুষ থাকা জরুরি। আমার সঙ্গে আছেন সফিউল। কালো, লম্বা, রোগা। থুতনিতে একটু কুচকুচে দাড়ি। চুল তেল দিয়ে পাট করে আঁচড়ানো। স্বেচ্ছায় আমার গাইড হয়ে যাচ্ছেন কৈখালি। কোচবিহারের সীমান্ত এলাকায় সেটাই প্রথম গমন। সীমান্তে চোরাচালান হয় কি না তা জিজ্ঞেস করতেই সফিউলবাবু দাঁত বার করে জানালেন, 'হয় তো! না হলে চলবে কী করে? তবে এখন ঝামেলা বেড়েছে।'

'কাঁটাতার হওয়ায় গোরু পার করতে অসুবিধা হচ্ছে?'

সফিউল বোঝায় যে, গোরু পাচারের জন্য সেরা জায়গা হল চাংড়াবান্ধা। নদীর উপর তো বেড়া থাকে না। মানসাই নদী দিয়েও গোরু পার করা হয়, তবে সে জায়গা আরও পুবে। কৈখালিতে নয়।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে খইরুল আমাকে হাঁটাপথে একটু ঝোপজঙ্গলে ঘেরা একটা জমিতে নিয়ে এসে যখন বলল, 'ওই পিলারটার পর থেকেই বাংলাদেশ', তখন অবশ্যি আমি দেশান্তরের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাইনি। বিএসএফ বা বিডিআর কিছুই দেখা গেল না। খইরুল বলল, বিএসএফ নজর রাখছে।

কৈখালি আর দক্ষিণ বেরুবাড়ির বর্ডারের মধ্যে আদৌ যে পার্থক্য থাকবে না তা অনুমান করছিলাম। পৌঁছে দেখলাম ঠিক তা-ই। রাইফেল কাঁধে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে এক জওয়ান এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। সফিউল আশ্বস্ত করল 'আমার চেনা' বলে। জওয়ান আমাকে কিঞ্চিৎ জেরা করে প্রথমে ভাবল 'পত্রকার'। তারপর যখন বুঝল যে 'কহানিকার', তখন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। 'কহানি'তে সত্যি লিখলেও কিছু প্রমাণ হয় না। অভিযোগও তোলা যায় না।

কয়েক মাস সিতাইকে সেন্টার করে সীমান্তে ঘোরাঘুরি করলাম। চোরখানা, চামটা, সাতভাণ্ডারী, কায়েতের বাড়ি। তার কাঁটার বেড়া আছে। সীমা সুরক্ষা বল আছে। বর্ডার রোড ধরে টহলদারি আছে। সীমান্ত পারাপারও আছে। কায়েতের বাড়ি থেকে রাস্তা তো বর্ডার রোড টপকে সোজা চলে গিয়েছে ওপারে। জানা গেল, রাস্তা ধরেই মালপত্র নিয়ে ওপারের ভেলগুড়িতে চলে যাওয়া যেত। এখন অন্য উপায়। কিন্তু সে উপায় খোলসা করে জানাল না কেউ। টুকটাক গল্প করে অবশ্য এটা বুঝেছিলাম যে, বাড়ির খবরের কাগজের স্তূপ এখানে হাজির করলে পঞ্চাশ টাকা কেজিতে বেচে দেওয়া যেত।

উক্ত গ্রামগুলির অধিকাংশেই কোনও খবরের কাগজ যায় না।

দিন গড়াল। ২০১৩ নাগাদ সেন্টার বদলে হল নতুনবাজার বলে একটা জায়গা। সীমান্ত থেকে কিঞ্চিৎ দূরে, কিন্তু আদাবাড়ি ঘাটের চার কিলোমিটার আগে। সে ঘাট আসলে মানসাই ওরফে জলঢাকা পার হওয়ার ঘাট। সেতু নেই। ভুটভুটি লাগানো নৌকা চলে বড় বড়। শুখার সময় চরের উপর দিয়ে বাঁশের বেড়ার রাস্তা বানিয়ে দেয় ইজারাদার। পারানি দিয়ে হেঁটে, বাইক, সাইকেল, ছোট গাড়িতে লোক পারাপার করে। ওপারে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। দশ কিলোমিটার গেলে দিনহাটা। আর বেশ খানিকটা আগে গোসানিমারি। মোগল আক্রমণ ঠেকাবার জন্য তৈরি করা উঁচু বাঁধের মতো প্রাচীর আদাবাড়ি ঘাটের আগে শিলদুয়ার ছুঁয়ে, নতুন বাজারের পিছন দিয়ে চলে গিয়েছে। রাশি রাশি প্রাচীন ইট। যে যার মতো নিয়ে যায়। সফিউলসহ আরও কেউ কেউ জানিয়েছিল যে, আসল পাচার দিনহাটার দিকে। মানসাই নদীরও নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেখানে। ফলে গুটিগুটি পায়ে আদাবাড়ি ঘাটে নামলাম বাস থেকে একদিন। মাথাভাঙা টু সিতাইয়ের রাস্তা তদ্দিনে দ্বিগুণ চওড়া আর নতুন। গাড়ি ছুটছে সাঁই সাঁই করে। নতুনবাজারের একদিকে ঘাট এবং আরেক দিকে শীতলখুচি এবার হবে আমার নতুন সীমান্ত টার্গেট।

সময়টা শীতের ছিল। ঘাটের অদূরেই মানসাইয়ের উপর সেতু নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই সেতু এলাকার যোগাযোগব্যবস্থায় যে বিপ্লব আনবে, সন্দেহ নেই। আমি নদীর সমান্তরালে একটু দক্ষিণে হাঁটা দিলাম। লাইটার থাকা সত্ত্বেও একজনের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে বিড়ি ধরিয়ে একটা অফার করলাম। আলাপ হয়ে গেল। গরিব মানুষ। বোধহয় আমার মতো শ্রোতা আগে পাননি। ঘণ্টাখানেকের গল্পে অনেক কিছু বলে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে, সীমান্তের চোরাচালান আসলে হয় দিনহাটার দিকের সীমান্তে। আমি সিতাইকে কেন্দ্র করে যেসব গ্রামে গিয়েছি, সেখানে ছোটখাটো চালানকারীরা থাকে। বড়জোর পঞ্চায়েতের সদস্য কি লোকাল নেতা

চালায়। কিন্তু দিনহাটার ওদিকের ব্যবসায় কে নেই? আর এদিকে চালান হয় গাঁজা। শিলদুয়ারের কাছে রাস্তার পাশের বস্তিগুলোয় তল্লাশি চালালেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়বার ঘাটে গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকা এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে গল্প হয়েছিল। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, তোর্সা আর মানসাই— দুটো নদীই বাংলাদেশে ঢুকে গিয়েছে। দুই নদীর মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকাটাই যাবতীয় চালানের ঘাঁটি। দিনহাটা হল কেন্দ্র। ব্রহ্মপুত্র যেখানে আসাম পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে, সেটা দিনহাটা থেকে খুব কিছু দূরে নয়। মাঝে খানিকটা বাংলাদেশের ভূমি। দিনহাটা থেকে ধুবড়ি অঞ্চলটা বহু দিনের পুরনো বাণিজ্যপথ। বুঝলাম যে, মানসাইয়ের এপারে আর বিশেষ কিছু পাওয়ার নেই। বছরের শেষের দিকে শেষ ঘাঁটি হল শীতলখুচিতে। এখানে সকালে উঠে খবরের কাগজ, পত্রিকা পাওয়া যায়। সিতাইতেও যেত। কিন্তু শীতলখুচি বেশ পছন্দ হল আমার। প্রথম যে দিন থাকব বলে সন্ধে নাগাদ পৌঁছালাম, তখন দেখি বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া বাজারে প্রবল উত্তেজনা। বিএসএফ জওয়ানদের দু'জনকে ধরে এলাকাবাসী নাকি বেজায় ধোলাই দিয়েছে। পরদিন জেনেছিলাম, সীমা সুরক্ষা বলের সদস্যদের মাঝে মাঝে ঠেঙানোটা নাকি শীতলখুচির বৈশিষ্ট্য। জওয়ানরা দাদাগিরি করলেই ওই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বুঝলাম এবার কিছু মিলবে। বিকেলের দিকে বেগুনি-ফুলুরি ভাজা একজনের কাছে জানলাম, টাকা ফেললে কালকেই ইলিশ এনে দেবে। একটু পরে বাজারে ঢুকে দেখি অনেক দোকানেই বাংলাদেশের 'প্রাণ' কোম্পানির বিস্কুটের প্যাকেট শোভা পাচ্ছে। দাম বেশ চড়া। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখি সে দেশের গুড়ও পাওয়া যাচ্ছে।

৪

শীতলখুচিতে দু'-তিনবার যাওয়ার পর উদ্যোগ শুরু হল। এখন আর বাস নয়, আসছি গুরুজনের কাছ থেকে একটা হাল আমলের স্কুটার ধার করে। শীতলখুচি বাজারের ঠিক আগে মাথাভাঙা থেকে আসা রাস্তাটা নব্বই ডিগ্রিতে বাঁক নিয়ে আদাবাড়ি ঘাটের দিকে চলে গিয়েছে পুব বরাবর। আর পশ্চিমে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ছুটেছে সীমান্ত অভিমুখে। সে রাস্তা ধরে যেতে গিয়ে বাঁ দিকের যে কোনও রাস্তা পেলে বুঝবেন, সেটা আপনাকে সীমান্তেই নিয়ে যাবে। আমি সোজাই গেলাম। কারণ সেটাও সীমান্তগামী। বর্ডার রোডের কিঞ্চিৎ আগে একটা বাজার। সেটা তখন প্রায় বন্ধ। চা-খাবারের দোকান খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম সেখানে। একজনই খদ্দের বসে ছিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যে ভাব জমে গেল। আমার পরিচয় বোঝার পর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ক্রাইম পেট্রোলের মতো গল্প লেখেন তো? শুটিং হবে না এখানে?'

তারপর জানালেন, 'পাচার এদিকে তেমন নাই। খুব কড়াকড়ি। স্যাখ হাসিনা তো ইন্ডিয়ার বন্ধু। খালেদা জিয়ার আমলে তো বিডিআর বর্ডার দিয়া ডাকাইত ঢুকাইত। হাসিনা আসার পর কোমসে। অহন তো নাই বললেই সলে।'

তারপর বললেন, 'বিএসএফ-এর সঙ্গে কথা বলবেন তো সলেন। সামনেই গেট।'

কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে একটা বড় গেট। বেড়া দেওয়ার ফলে এপারের কোনও কোনও লোকের জমির খানিকটা বেড়ার ওপারে চলে গিয়েছে। গেট দিয়ে তারা সে জমি চাষ করতে যায়। তাই গেটের সামনে একটা ছোট ঘর আছে। বিএসএফ-এর জওয়ান সেখানে বসে চাষিকে পাহারা দেয়। গেট খোলে, বন্ধ করে। সদ্য আলাপ হওয়া

ব্যক্তির সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখি একজন বেড়ার ওপারে জমিতে কাজ করছেন, আর ঘরে বসে অলস চোখে পাহারা দিচ্ছেন দুই জওয়ান। সঙ্গী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'বর্ডার দেখতে আসছে।'

দু'জনের মধ্যে যিনি হুকুমদার, তাঁর বুকে আঁটা নেমপ্লেটে নজর বুলিয়ে বুঝলাম ঘোর হিন্দুস্তানি। কেঠো হিন্দিতে আমার সুলুকসন্ধান জানতে চাওয়া শুরু করলেন। আমি সত্তর শতাংশ বাংলায় জবাব দিলাম। 'কহানিয়াঁ' লিখব শুনে তিনি বললেন যে, বর্ডার বিলকুল শান্ত। কোনও ঝামেলা নেই। লেখার 'আইটেম'ই নেই এখানে। এবার আমি হিন্দিতে শুধালাম, 'লেকিন বিডিআর কো তো দিখাই নহি দিতে!'

'বিডিআর?' তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি দিলেন, 'কত পায় ব্যাটারা? বড়জোর আট হাজার। বাংলাদেশি টাকায়। এই মাইনেতে সংসার চলে নাকি? আর ওরা তো চায় পাচার হোক। নইলে ফ্যামিলি চলবে না। তাই থাকে না।'

আধ ঘণ্টা পর যখন ফিরছি, তখন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বর্ডারে পাচার হয় না বলছেন?' শুনে তিনি যেটা জানালেন, সেটা বেশ ভাববার। নেশার জিনিস কয়েকটা বাদ দিলে বাকি যা পাচার হয় তা সবই খাওয়া-পরার জিনিস। 'আমি তো বাড়ির শাড়ি-লুঙ্গি-জামা বাংলাদেশেরই কিনি। সস্তাও হয়। জিনিসও ভাল। তারপর ধরেন মাস, গুড়, দই। এ তো পাসার হবেই! এদিক থেকে স্টিলের বাসন, গোর—ঃ এইসব যায়। এগুলা ঠিক পাসার না, এগুলা হইল দরকার। নেশার জিনিস এদিক দিয়া যায় না। তার জায়গা আলাদা।'

সেই গ্রামটার নাম ছিল 'রাজার বাজার'। কিন্তু কিছুদিন পর শীতলখুচি থেকে সীমান্তবর্তী 'গাছতলা' গ্রামে পা দিয়েই মনে হল, ব্যাপারটা অত নিরামিষ নয়। ওপারে কিছুটা গেলেই হাতিবান্ধা। 'গাছতলা' থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে 'জায়গির নাওহাটি' হয়ে বড় মরিচায় এসে সিতাই রোডে আসা পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা সময় খোঁজখবর করতে করতেই এলাম। বুঝলাম, সেই ট্র্যাডিশনই চলছে। আসলে শীতলখুচি আর মাথাভাঙা— এই দুই ব্লকে প্রচুর গাঁজাখেত আছে। উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগই যায় বাংলাদেশে। এভাবেই যেত। হালে কড়াকড়ি-লেখালিখি ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ায় চালানের কৌশল বদলেছে। আগে তো মানসাই দিয়ে নৌকা ভরতি বোল্ডার যেত বাংলাদেশে।— একজন জানিয়েছিলেন। আরেকজন দাবি করেছিলেন যে, তিনি গাঁজা পাচারের দালালি করেন।

এর পর আরও কয়েকবার গিয়েছি। দেখেছি সবই আসলে 'ওপেন সিক্রেট'। গাঁজার চাষে মেয়েরাই বেশি যুক্ত। ছেলেরা কেবল খদ্দের জোগাড় করে মালটা চালান করে দেয়। মাটির মেঝেতে বসে গাঁজা ঝাড়াই-বাছাই করতে করতে আমার সঙ্গে

গল্প করেছেন বাড়ির বউ-মেয়েরা। মাঝে মাঝেই খবরে দেখি যে, এইসব এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজার খেত জ্বালিয়ে দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। সে কথা জিজ্ঞেস করতেই বাড়ির বউ হাসতে হাসতে জানিয়েছিল, অল্প একটু জমিতে যা ফসল হয়, তাতে একটা সংসারের চলে যায়। পুলিশ খেত না জ্বালালে বেশির ভাগটা এমনিই নষ্ট হয়ে যেত। আর হ্যাঁ, গোটা কোচবিহার সীমান্ত জুড়েই কমবেশি চালান হয়। সবচাইতে ঝুঁকি হল গোরু পাচারে। লোক আসা কমে এসেছে অনেকটা। কারণ, এখন চট করে র‍্যাশন কার্ড মেলে না।

আমি সেই মাটির মেঝের কোনায় তক্তপোশের নিচে রাখা খবরের কাগজের বান্ডিলও দেখেছি।

৫

চাংড়াবান্ধা সীমান্তের খবর, সমস্যা, উপদ্রব ইত্যাদির খবর সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত আসে। কিন্তু যেসব স্থানের কথা বললাম, তাদের খবর সাংবাদিক অবধি পৌঁছায় না। ফলে নিশ্চিন্তে, ধীর ছন্দে সেসব জায়গায় সম্পাদিত হয় সীমান্তের বিশেষ 'কর্ম'। ডুয়ার্সের বাংলাদেশ সীমান্তের সিংহভাগটাই পড়েছে কোচবিহার জেলায়। জলপাইগুড়ি জেলায় বাকি একটুখানি। সীমান্তবর্তী গ্রাম মানেই 'পকেট প্লেস'। ডুয়ার্সের বৃহত্তর জনসংখ্যার মনে এই গ্রামগুলির কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু সেই গ্রামগুলিতেও মানবসভ্যতা বিরাজমান। সংসারের নিত্যকর্ম সেখানেও উপস্থিত। তাই তারা মোবাইল ফোনের জন্য বাংলাদেশি সিম কার্ডে বেশি আস্থা রাখে। তারকাঁটার বেড়ার এপাশ থেকে ছুড়ে দেয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। নেশার দ্রব্য বাদ দিলে বাকি আদানপ্রদান চলে বিনিময় প্রথায়। ফোনে কথা হয়। ভারতে পেঁয়াজের দাম চড়ে গেলে তা ওপাশ থেকে ছুড়ে দেওয়া হয়। এপারের গেরস্ত নিক্ষেপ করে সাইকেলের টায়ার। চালান সেখানে বেঁচে থাকার বিকল্প। বিএসএফ বোধহয় এটা জানে।

আর যারা ট্রাকে ট্রাকে কাশির সিরাপ, টন টন মাদক ওপারে পাঠাচ্ছে, তারা?

না। তারা কেউ সেসব গ্রামের বাসিন্দা নন। তারা সব নগর নিবাসী রহস্যময় অজ্ঞাত ব্যক্তি। যে ছেলেটা আমার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত মূল্যে পুরনো খবরের কাগজ কিনে নিয়ে যেত, সে তার জায়গায় আরেকজনকে পাঠাবে বলে গিয়েছে গেল বার। সে নাকি অন্য কাজ পেয়েছে। কে জানে! হয়ত সেইসব অজ্ঞাত এবং রহস্যময় ব্যক্তির নেটওয়ার্ক তাকে 'তুলে' নিচ্ছে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ-২

ফিতের টানে চলছে পারাপার

এই ২০১৬ সালে যদি কেউ ক্যাসেট প্লেয়ার বা টেপরেকর্ডারের খোঁজ করেন, শুধু দোকানিই নয়, হাঁ করে তাকাবেন আশপাশের মানুষজনও। গান শোনার হাজারটা উপকরণের মধ্যে প্রাগৈতিহসিক ক্যাসেট নেহাতই ফসিল। কিন্তু এ হল এমন এক গঞ্জ, যেখানে ক্যাসেট এখনও কাজের জিনিস। না, একটু ভুল হল, ঠিক ক্যাসেট নয়, চাহিদা হল ক্যাসেটটির ভিতরে থাকা টেপটির। বলা বাহুল্য, ভারত-বাংলাদেশ এই সীমান্ত অঞ্চলে সংগীতচর্চা বেড়েছে, এমন কোনও খবর এখনও নেই।

হেঁয়ালি থাক, আসল কথায় আসি। চকচকে ওই স্বচ্ছ টেপ এখানে ব্যবহার করা হয় জাল নোট পাচারের কাজে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ সীমান্তের কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর যদি জাল নোট পাচারের স্বর্গরাজ্য হয়, তবে ক্যাসেটের ফিতে এ রাজ্যের অন্যতম অলংকার। কাঁটাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে কেউ এই ফিতের সঙ্গে নোটের বান্ডিল বেঁধে দিল, আর এ প্রান্তে তার কোনও সহযোগী ধীরে ধীরে টানতে লাগল সেই ফিতে। ধীরে, খুব ধীরে, যেন নজরে না পড়ে। ওই স্বচ্ছ ফিতে প্রায় মিশে যায় ঘাসজমির সঙ্গে। অব্যবহৃত ইরিগেশন দপ্তরের কোনও পাইপ হলে পরে সেই ফিতের নিজেকে লুকিয়ে রাখা আরও সহজ।

এমনই সরল, গ্রাম্য উদ্ভাবনীর সঙ্গে যুঝতে হয় গোয়েন্দা দপ্তরকে। যে পরিমাণ জাল ভারতীয় টাকা দেশে ঢোকে, তার ৪৫ শতাংশই আসে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা দিয়ে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ) সূত্র থেকে এমনটাই দাবি করা হয়। মাঝে মাঝে পাচারের পদ্ধতিটি আরও সরল। প্যাকেটে মোড়ানো টাকার বান্ডিল কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে ছুড়ে দেওয়া হল, এপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে সংগ্রহ করে নিল কেউ। এভাবে ছোড়া কিছু প্যাকেট অবশ্যই ধরা পড়ে বিএসএফ-এর হাতে, তবে অধিকাংশই নিরাপদে পৌঁছায় গন্তব্যে... আর সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। এনআইএ-র কথামতো, কালিয়াচক বরাবরই জাল টাকা পাচারের অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু সম্প্রতি এই পরিমাণটা উদ্‌বেগজনকভাবে বাড়ছে।

২০১৩ সালে যেখানে উদ্ধার হওয়া জাল টাকার পরিমাণ ১.৪৩ কোটি, ২০১৫-য় পরিমাণটা ১.৯৭ কোটি এবং এটা বিপুল পরিমাণ জাল টাকার ভগ্নাংশমাত্র। গোয়েন্দা

বিভাগ নিজেই স্বীকার করে, ধরা পড়ে ৫-৭ শতাংশ মাত্র। কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্ভুক্ত সীমান্ত-ঘেঁষা ১৮টি গ্রামই এই জাল টাকা পাচারের 'ট্রানজিট রুট'। মোহব্বতপুর, চরিঅনন্তপুর, গোলাপগঞ্জ, দুইশতবিঘি— গ্রামগুলোর শরীর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সীমাহীন দারিদ্র আর অযত্নের ছাপ বড় স্পষ্ট। পাকা রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র— সবই দূরতম দ্বীপের মতো। মহিলাদের বিড়ি বাঁধা আর পুরুষের অনিয়মিত শ্রমিকের কাজ— এ ছাড়া জীবিকার অন্য কোনও পথ নেই। মোট ১৭২ কিমি বাংলাদেশ সীমান্ত। এর মধ্যে কাঁটাতার নেই এমন সীমানার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫ কিমি। এ ছাড়াও আছে নদী সীমান্ত। চোরাচালানের তালিকায় গোরু, ফেন্সিডিল, থাকলেও এ মুহূর্তে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবশ্যই জাল টাকা। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর বা রাজশাহি থেকেই মালদায় ঢোকে এই নোট। মালদার কালিয়াচক বা বৈষ্ণবনগরকেই বেছে নেবার কারণটা অবশ্য ভৌগোলিক। জাতীয় সড়ক বা রেল স্টেশন যেমন খুব কাছে, তেমনই কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে বয়ে চলা গঙ্গা পার হলেই ওপারে ঝাড়খণ্ড। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই জাল নোট ছড়িয়ে পড়ার বিপুল সুযোগ। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা এ ক্ষেত্রে বাহকের কাজ করে। রাজস্থান, পাঞ্জাব, দিল্লি, এমনকি মহারাষ্ট্র, কেরালাতেও এদের হাত দিয়েই ছড়িয়ে পড়ে জাল নোট। আপাতদৃষ্টিতে আসল নোটের সঙ্গে ফারাক করা যায় না। 'বস্তুত, এত উন্নতমানের নোট বাংলাদেশ তৈরি করতে পারে— এটা বিশ্বাসই করা যায় না', বললেন মালদার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। একই মত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরেরও। কয়েক মাস আগে কালিয়াচকের বাসিন্দা শাজাহান শেখকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। এই পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডা সে। তার সঙ্গে আইএসআই-এর যোগাযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। কিন্তু এসব তো অনেক বড় ব্যাপার। দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্তের গল্প। এসব কথায় মন নেই ঘিঞ্জি ঘরগুলোর বাসিন্দাদের। পুরুষদের সঙ্গে মহিলারা, এমনকি শিশুরাও জেনে গিয়েছে, একটা প্যাকেট ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলেই হাজার বিড়ি বাঁধার থেকে অনেক বেশি উপার্জন। ঝুঁকি একটু থাকলও বা!

মোহব্বতপুরের বাসরঘরে অভাবের ফুটো দিয়েই ঢোকে অপরাধের সাপ। গ্রামের একটিও পরিবার নেই, যেখানে কোনও না কোনও সদস্য ধরা পড়েনি জাল টাকা পাচারের দায়ে। ২০ বছরের আশা বেগম,

> প্যাকেটে মোড়ানো টাকার বান্ডিল কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে ছুড়ে দেওয়া হল, এপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে সংগ্রহ করে নিল কেউ। এভাবে ছোড়া কিছু প্যাকেট অবশ্যই ধরা পড়ে বিএসএফ-এর হাতে, তবে অধিকাংশই নিরাপদে পৌঁছায় গন্তব্যে...

কোলে একটি শিশু আর ঘিরে থাকা আরও তিনটিকে নিয়ে বোঝাতে ব্যস্ত, তার স্বামী একদিনই একটা বান্ডিল নিয়ে গিয়েছিল, তার জেরেই পুলিশ আটকে রেখেছে ভিন রাজ্যে। তার স্বামী নাজিবুল ২০১২ সালে গ্রেপ্তার হয় গাজিয়াবাদে। সিবিআই চিঠি দিয়ে আশাকে জানিয়েছিল, ৪ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে নাজিবুলের কাছ থেকে। আর এদিকে চার সন্তান আর বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ভিক্ষে করে বেঁচে থাকা আশা যখন বলে, 'বিশ্বাস করুন, এক লক্ষ টাকা কেমন দেখতে হয়, তা-ও জানি না...' ওকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ ঘটে না। তাই রাজনীতি করা হজরত আলির ব্যাখ্যাটি বরং অনেক বিশ্বাসযোগ্য, 'বিড়ি বাঁধার কাজটাও সারা বছর থাকে না। লেবারের কাজ পাওয়া আরও অনিশ্চিত, এমনকি ভিন রাজ্যেও। এই মানুষগুলোকে তাই লোভ দেখানো খুব সহজ।' একশো-দুশো টাকার বিনিময়ে বর্ডার থেকে নিয়ে আসছে বান্ডিল, পৌঁছে দিচ্ছে গ্রামের নির্দিষ্ট বাড়িতে। আর কে না জানে, 'দেশের অর্থনীতি' গোছের বিজাতীয় শব্দের তুলনায় পেটের দায়টা অনেক কাছের!

শুভ্র মৈত্র

সীমান্ত পারাপারে যাত্রীরা নাজেহাল ফুলবাড়ি চেকপোস্টে

রংপুরের নাজমা খাতুন মিশুকের ৭ বছরের সন্তান বাবুল শিলিগুড়ির এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বাবুলকে নিয়ে মিশুককে বছরে বেশ কয়েকবার সীমান্ত পার হয়ে এ দেশে আসতে হয়। ঢাকার আসমা আব্বাসির ১২ বছরের মেয়ে আকাশি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, তাকে নিয়ে কার্শিয়াঙে আসছিলেন আসমা। এতদিন মেখলিগঞ্জের চাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়েই আসতেন তাঁরা, কিন্তু ফুলবাড়ি সীমান্ত খুলে যাওয়ায় এ পথটিই বেছেছিলেন এই এপ্রিলে। কিন্তু যে দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সীমান্ত পার হলেন তাঁরা, তাতে এ পথ আর মাড়াতে চান না। শুধু এঁরাই নন, এ দেশ থেকে ঢাকায় এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে যাওয়া দুই সাহিত্যিকেরও একই রকম অভিজ্ঞতা। দু'দেশের মানুষের অনেক আশা ছিল এই নতুন উন্মোচিত সীমান্ত নিয়ে, কিন্তু এই ১৮ এপ্রিল দু'মাস পার হতে না হতেই তারা হতাশ ও বিমুখ।

এপারে ফুলবাড়ি, ওপারে বাংলাবান্দা, মাঝের কাঁটাতার সরিয়ে খুলে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন ১৯৪৭-এ দু'দেশ হয়ে যাওয়া এ বাংলা-ও বাংলার মানুষরা। দু'পারের পর্যটনপিয়াসি মানুষ পড়াশোনার জন্য এক নতুন দ্বার খুলে যাওয়ায় প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিলেন। অবশেষে খুলেছিল সেই দ্বার। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি দু'দেশের মন্ত্রী-আমলাদের উপস্থিতিতে ঘটা করে পারাপারের সূচনা হল। কিন্তু সব প্রত্যাশাই পূর্ণ হওয়াটা বোধহয় উত্তরের এই প্রান্তিক অঞ্চলের ভাগ্যে থাকে না। তা না হলে প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত, এখনও ফুলবাড়ি-বাংলাবান্দা সীমান্ত পারাপারের যাত্রীকে সমস্যায় বিপর্যস্ত হতে হবে কেন? এতদিনেও পরিকাঠামোর হাল এত হতশ্রী কেন?

মাঝে 'জিরো পয়েন্ট'-এর কয়েক গজ বাদ দিলে দু'পাশেই পিচ বাঁধানো রাস্তা হয়েছে। এপারে প্রশাসনিক কাজের জন্য বাড়িও তৈরি হয়েছে। অথচ এতদিনের চালু সীমান্ত চৌকি মেখলিগঞ্জের চাংড়াবান্ধা-বুড়িমারি সীমান্তের ভারতের দিকে তৈরি হয়নি। আজও হয়নি এপার থেকে ফুলবাড়ি বা ওপারের বাংলাবান্দা থেকে অন্যত্র যাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত। ওদিকে বাংলাবান্দা থেকে পঞ্চগড়ের দূরত্ব ৫৭ কিমি, ব্যক্তিগত যানবাহন ছাড়া কোনও ভরসা নেই। এদিকে ৭ কিমি শিলিগুড়ি। দু'পারেই যাতায়াতের জন্য হাপিত্যেশ করে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গতি নেই। এর উপর দু'পারেই গড়ে ওঠা দালালচক্রের খপ্পর, 'ইমিগ্রেশন ভিখারি'দের পাতা হাত থেকে নিস্তার নেই কারও। শত চেষ্টা করেও এক পা-ও এগতে পারবেন না। এসব একেবারে খুল্লমখুল্লা। কিন্তু পারাপারের যাত্রীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয় ইমিগ্রেশন বিভাগ, কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট ও রাজ্য পুলিশ প্রভৃতি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে। একটা হার্ডল টপকালে আর-একটা, নাজেহাল হতে হচ্ছে প্রত্যেককে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাই অধিকাংশ যাত্রীই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছেন চাংড়াবান্ধা-বুড়িমারি সীমান্তে। ক্ষোভ বাড়ছে পঞ্চগড় ও শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের, যাঁরা সে দিন স্বপ্ন দেখেছিলেন বিঘ্নমুক্ত নিকটস্থ সীমান্ত চৌকি তাঁদের সামনে ব্যবসার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের সঙ্গে বাংলাদেশের সড়কপথে সীমান্ত পারাপারের জন্য মূলত ব্যবহার করে আসছিলেন এপারের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের চাংড়াবান্ধা, ওপারের পাটগ্রামের বুড়িমারি সীমান্ত দ্বার। এই পারাপার পথটির গুরুত্ব বেশি এই কারণেই যে, এই পথটিই ব্যবহৃত হয় ভুটানের জয়গাঁ সীমান্ত দিয়ে যোগাযোগের জন্য। মাঝে তিস্তা সেতুকে রাখলে চাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি দু'দিকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরত্বে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রংপুরসহ ওপারের উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহরের অনেকগুলোর সঙ্গেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে বুড়িমারির দূরত্ব কিছুটা কম। ওপারের যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নত থাকায় পর্যটকরা এই সীমান্তপথ ব্যবহার করছেন অনেকদিন ধরেই। ওপার থেকে ঢাকার যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত আরও একটি কারণ। বিকেল ৬টা থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার গাড়ি রয়েছে, যা ভোর ৫টা-৬টার মধ্যে ঢাকা পৌঁছে দেয়। এ ছাড়াও ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শিলিগুড়ি থেকে শ্যামলী পরিবহণের পরিষেবা রয়েছে, যা এই পথ ব্যবহার করছে।

লেখাপড়া ও ব্যবসার কারণে শিলিগুড়ির সঙ্গে পঞ্চগড়সহ এই অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য ফুলবাড়ি চেকপোস্টের দাবি দু'দেশের ব্যবসায়ীরা অনেকদিন ধরেই

করে আসছিলেন। এক সময় সবচেয়ে জোরালো দাবি উঠেছিল তেঁতুলিয়া করিডর চালু করার জন্য। বিষয়টি বেশ কয়েকবার সংসদে তুলেছিলেন পূর্বতন সাংসদ মানিক সান্যাল ও মিনতি সেন। ১৯৯৬-৯৭-তে সার্ভেও করেছিলেন দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধিদল। ইতিহাসের পাতা উলটে দেখা যাবে, ১৯৪৭-এর দেশভাগের আগে গঠিত সীমান্ত বিভাজনরেখা তৈরি করার জন্য র‍্যাডক্লিফ কমিশনের প্রস্তাবমতো উত্তরবঙ্গের তিন জেলার অনেকটা অংশই

ফলে যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে প্রথমে দ্বিতলে অভিভাষণ বিভাগে টেনে তুলতে হয়। কোনও লিফ্‌ট নেই, সিঁড়ি দিয়ে টেনেটুনে মালপত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে এক প্রস্থ পরীক্ষাপর্ব শেষ করে যাত্রীকেই সেগুলো আবার নিচে নামিয়ে আনতে হয়। এর পর স্ক্যানারের সামনে লাইনে অপেক্ষা।

খণ্ডিত করে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে জলপাইগুড়ির ৫টি থানা বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম ও দেবীগঞ্জ সীমান্তের ওপারে চলে যায়। আগে তেঁতুলিয়া সড়ক দিয়েই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ছিল। দেশভাগে সেই পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তেঁতুলিয়া সড়ক চালু হলে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ৮০ কিমি কমে যেত। কিন্তু গত দশকে অশোক ভট্টাচার্য পৌরমন্ত্রী থাকার সময় ফুলবাড়ি সীমান্তের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। বিগত ইউপিএ সরকারের সময় তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ২০০৪-এ দু'দেশের যৌথ সমীক্ষা হয়েছিল। পঞ্চগড় ও শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও উদ্যোগী হয়। পঞ্চগড় থেকে সাংসদ হওয়া নাজমুল হক প্রধান ও দেশের সরকারকে তৎপর করতে উদ্যোগী হন। অবশেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সেই বহু প্রতীক্ষিত ফুলবাড়ি-বাংলাবান্দা সীমান্ত দু'দেশের নাগরিকদের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত হয়। এর আগে এই পথ শুধু পাথর ও পণ্যবাহী গাড়ির জন্য ব্যবহৃত হত। এই 'ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট' চালু হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ শুধু নয়, নেপাল ও ভুটানের ব্যবসায়ীরাও আশান্বিত হয়েছিলেন। প্রত্যাশা ছিল যে, ভারতের ফুলবাড়ি-শিলিগুড়ি, বাংলাদেশের বাংলাবান্দা-পঞ্চগড়, নেপালের ধুলাবাড়ি-বিরাটনগর ও ভুটানের ফুন্টশিলিংকে এক ছাতার নিচে আনা গেলে সার্কের চার দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

এই সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের পঞ্চগড় মাত্র ৫৭ কিমি, শিলিগুড়ি থেকে ৭ কিমি, নেপালের কাঁকরভিটা সীমান্ত মাত্র ৩৫ কিমি। ভুটানের ফুন্টশিলিং সীমান্ত পৌঁছে যাওয়া যাবে মাত্র ৪ ঘণ্টায়, সিকিমের গ্যাংটক যেতে লাগবে ঘণ্টা পাঁচেক। সবচেয়ে সুবিধার ছিল ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি, ঢাকার দূরত্ব কমে দাঁড়াত ৪৮১ কিমি মাত্র। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে দিচ্ছে দু'দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর উদ্‌বোধন-পরবর্তী শিথিলতা। গত ৮ তারিখে ওপারের সংবাদকর্মীরা মিলিত হয়েছিলেন সীমান্তের ধারে, তাঁদের পক্ষ থেকেও ক্ষোভ জানানো হয়। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনে এপার থেকে যাচ্ছিলেন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির দুই সাহিত্যিক, সীমান্তের হেনস্তায় নাজেহাল তাঁরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ভবনের মধ্যেই শুল্ক বিভাগ, রাজ্য পুলিশ, ইমিগ্রেশন বিভাগ রয়েছে— এতে যাত্রীদের সুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে চেহারাটা ভিন্ন। মালপত্র স্ক্যান করার যন্ত্রটি শুল্ক দপ্তরের হেপাজতে থাকার কথা, কিন্তু তা রয়েছে রাজ্য পুলিশের হেপাজতে। ফলে যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে প্রথমে দ্বিতলে অভিভাষণ বিভাগে টেনে তুলতে হয়। কোনও লিফ্‌ট নেই, সিঁড়ি দিয়ে টেনেটুনে মালপত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে এক প্রস্থ পরীক্ষাপর্ব শেষ করে যাত্রীকেই সেগুলো আবার নিচে নামিয়ে আনতে হয়। এর পর স্ক্যানারের সামনে লাইনে অপেক্ষা। এর পর তৃতীয় দফার চেকিং সীমান্তরক্ষীর, আবার ব্যাগ-সুটকেস খোলাখুলি। ইমিগ্রেশন বিভাগের আধিকারিক এ শর্মা এ বিষয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। এখনে কোনও মালবাহক নেই, ঢাকা থেকে কেউ এলে সারারাত সড়কযাত্রার পর এভাবেই কয়েক ঘণ্টা এ ঘর-ও ঘর করতে হয়। কখনও এই তলা থেকে ওই তলা ওঠানামা করতে হয়। এর পরের ঝঞ্ঝাট হল, সেখান থেকে এদিকে আসা ও ওদিকে যাওয়ার কোনও পরিবহণ পরিষেবা নেই। ফলত, অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে আসতে হয় অভীষ্টে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তাই অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন চাংড়াবান্ধা-বুড়িমারি সীমান্তে। নতুন সীমান্তে অনেক আশা নিয়ে যাঁরা বৈদেশিক টাকা বিনিময়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তারাও হতাশ। অনেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন।

গৌতম গুহ রায়

খুচরো ডুয়ার্স

ধর দিকি

বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের বারোপেটিয়া এলাকার এক চা-বাগানে এক চিতাবাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দিব্যি চৌর্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। এলাকার গেরস্তদের হাঁসটা, মুরগিটা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার কুকুরও ভ্যানিশ। তখনই সন্দেহ হয় যে, এটা

নির্ঘাত কোনও চিতা বাঘের কাজ। অমনি আয়োজন করে ফাঁদ পাতা হল। কী তাজ্জব ব্যাপার! ফাঁদে রাখা নধর পাঁঠা তেমনই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু খানিক দূরে কোনও গেরস্তর হাঁস উধাও! ফাঁদের দিকে আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই চিতা বাঘবাবাজির। বন দপ্তরের মতে, সেই ব্যাটা নাকি আগে বার দুয়েক ফাঁদে পা দিয়েছিল, তাই অতীতের অভিজ্ঞতা খাটিয়ে ফাঁদ-পাতিয়েদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। হুঁ হুঁ বাবা! ঘড়াম ঘ্রাঁউ ঘ্যাঁক! এবার ধর দিকি!

হেটো সমস্যা

ডামডিম হাটের ইজারা যিনি নিয়েছেন, তিনি নাকি বেজায় আতান্তরে পড়েছেন। টু-পাইস আয় হবে বলেই না ইজারা নেওয়া। কিন্তু আদায় করতে গেলেই নাকি এক গন্ডা মহিলা তেড়ে এসে তাড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁকে। কানাঘুষোয় শোনা গেল যে, সেই মহিলা চতুষ্টয় যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, ইজারা সে গোষ্ঠীরই পাওয়ার কথা ছিল। শেষ বেলায় ফসকে যাওয়ায় এহেন প্রতিবাদ। তবে ঝামেলা নাকি মিটে গিয়েছে। যাক বাবা! মিটলেই ভাল। হাঁড়ি জিনিসটা হাটে ভাঙার চাইতে বেচাই ভাল— কী কন কত্তা?

মশা মশাই

কে না জানে যে, ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া মোগল সেনাদের খাবি খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ম্যালেরিয়া হল ডুয়ার্সের হেরিটেজ। তাই ফি-বছর এই তল্লাটে ম্যালেরিয়ার ধাক্কায় অনেকেই ভূমিকম্পতুল্য ঝাঁকুনি দেহে অনুভব করেন। অভাগা কেউ কেউ ইহলোকও ত্যাগ করেন। ডুয়ার্সের সব পুরসভা ডাহা ফেল!

তা মশায়, মশক নিয়ে এত কথা বলছি কেন বলুন দিকি? গত ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালিত হল যে ডুয়ার্সের ইতিউতি। তাই মনে পড়ল। শুনলেম, মশারা নাকি এই সংবাদ পেয়ে মুচকি হেসেছে।

হুম হুম

দিনহাটার তরমুজ— যাকে বলে সেই তরমুজ, যার বাইরেটা সবুজ, কিন্তু ভিতরটা সিপিএম-এর মতো লাল। খেতেও খাসা। এবার আবহাওয়াগত কারণে দিনহাটায় খুব একটা তরমুজ ফলেনি। মানসাই নদীর চরেও তরমুজ কম জন্মেছে। তা সত্ত্বেও চাষিরা দাম পাচ্ছেন না ফসলের। ফলন কম হওয়ায় দাম বৃদ্ধি তো দূরের কথা, চাষের খচ্চাই নাকি উঠছে না। এমন তো হওয়ার কথা নয়! শুনে কেউ কেউ 'পলিটিক্যালি' বলছেন যে, তরমুজ হল 'জোট'-এর প্রতীক। তাই মানুষ নিচ্ছেন না। তা কত্তা, রসিকতা ছাড়ুন! আজকের যুগে সরেস তরমুজের খদ্দের মিলবে না তা কি হয়? পলিটিক্স বাদ দিয়ে গলদটা কোথায় বলুন দিকি!

ঝড়ের ডুয়ার্স

বৈশাখ মাস জুড়ে ডুয়ার্সে দুমদাম ঝড় আর শিলাবৃষ্টির আয়োজন করেছিল বরুণদেবের

দপ্তর। বলা নেই, কওয়া নেই, আচমকা হাওয়ার তেজ বেড়ে যাওয়া আর শেষে মিনিটকয়েকের জোরদার ঝড়। সঙ্গে ফাউ হিসেবে শিলার পতন। সেসব শিলার সাইজ দেখে চোখ গোল হয়ে যাচ্ছে অনেকের। এদিকে ঝড়ের ধাক্কায় ঘরের চাল উড়ছে, গাছ কুপোকাত হচ্ছে, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ছে; আবার অন্য দিকে শিলের গুঁতোয় ফসলের দফা রফা। চা-চাষির মাথায় হাত! শখের ফুলবাগানে যেন প্রমত্ত হস্তীর আগমন! তবে ভাল দিকও আছে। গরমটা বৈশাখে ঠিক মালুম হয়নি ডুয়ার্সে। ওদিকে আবার বালুরঘাটে বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

খুচরো ডুয়ার্স

মাছকাহিনি

বর্ষার বেশ আগেই ডুয়ার্সের বহু নদীতে লাখ লাখ মাছের ছানা ছেড়ে দেয় মৎস্য দপ্তর। এবারও ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে লাখো লাখো মাছের বাচ্চা এসেছে ডুয়ার্সের নদীতে বড় হয়ে স্থানীয় মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার আশায়। কিন্তু 'ভোট' চলায় বেচারাদের আর নদীতে যাওয়া হচ্ছিল না। মাছের মতো মাছ হওয়ার আগেই অকালে বেচারাদের অনেকেই পটোল তুলছিল। শেষ দফা ভোট পার হতেই নাকি জীবিতদের দ্রুত ডুয়ার্সের নদীগুলিতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন দপ্তরের কর্তারা। আমরা তাদের সার্থক মৎস্যজীবন কামনা করি।

এঁচোড়

ডুয়ার্সে কাঁঠাল গাছের অভাব নেই। এই সে দিনও ডুয়ার্সে কেউ কাঁঠাল কিনে খেত না। এঁচোড় চাইলেই পাওয়া যেত গেরস্তর কাছে। কিন্তু দিন বদলেছে। এখন বাইরে থেকে ব্যবসায়ীদের লোক এসে ট্রাক ট্রাক এঁচোড় নিয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্স থেকে। হলদিবাড়ি এ ব্যাপারে নাকি ফার্স্ট। রশুন-পেঁয়াজ দিয়ে ঠিকমতো রান্না করতে পারলে এঁচোড় যে আশ্চর্য হয়ে ওঠে তা সক্কলেই জানে। এই 'গাছপাঁঠা'র ভবিষ্যৎ ডুয়ার্সে বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। 'দার্জিলিং চা'-এর মতো 'হলদিবাড়িয়ান এঁচোড়'ও নাকি ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। এঁচোড়ে পেকে যাওয়ার বেজায় সম্ভাবনা হলদিবাড়ির!

ভুটভুটি

মোটরবাইকের ইঞ্জিন লাগানো ভুটভুটি ওরফে ভ্যানো গাড়ি ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত জনপদে বেশ জনপ্রিয়। যদিও যখন-তখন এসব তিন চাকার গাড়ি উলটে যায়। সামলাতে না পেরে চালক মাঝে মাঝেই একে-তাকে গুঁতো মারে। তবুও বিকল্প নেই বলে ভ্যানো-ভুটভুটিতে মানুষ ওঠে। সরকারের খাতায় এ গাড়ি ঘোরতর অবৈধ হলেও দিব্যি চলে-ফিরে বেড়ায় সরকারেরই রাস্তা দিয়ে। ইদানীং কেউ কেউ এই গাড়িতে পেষাই যন্ত্র লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর গেরস্তর গম-চাল-হলুদ ইত্যাদি গুঁড়ো করে দিচ্ছেন। রায়গঞ্জের আশপাশে নাকি এই ব্যবসা এখন দিব্যি জনপ্রিয়। দোরগোড়ায় শস্য পেষাইয়ের কল পেয়ে গেরস্তও খুশি। কষ্ট করে আর মিল অবধি দৌড়াতে হচ্ছে না। তা মানুষ বহন না করে শস্য পেষাই করলে অবশ্যি বিষয়টাকে একটু সহানুভূতির চোখেই দেখা যায়। কী বলেন?

গুন্ডা মাল

মালবাজারে গুন্ডারাজ নিয়ে জোর হইচই। ট্রাক থামিয়ে তোলা আদায়ে স্থানীয়

গুন্ডাবাহিনীর নাকি জুড়ি মেলা ভার। সম্প্রতি বুদ্ধিমান রায় নামক এক ট্রাকচালককে তোলা দিতে না চাওয়ার কারণে গুলি করে হত্যাও করেছে গুন্ডারা। ব্যাপারটা যে উদ্‌বেগজনক তা বলাই বাহুল্য। মালবাজারের মতো সুন্দর শহরে এমন খুনখারাপির খবর মোটেও ভাল নয়। দলমত নির্বিশেষে মালবাজারবাসীরা তাই ভাবছেন যে, প্রশাসন ফেল করলে নিজেরাই সবাই মিলে গুন্ডা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবেন। সাধু উদ্যোগ। প্রশাসন নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছেন কথাটা? আর মালবাজার ব্লকের নদীগুলো থেকে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি-পাথর তুলছে কারা? তাঁরা অন্য গ্রহের জীব না মহামানব, যে গ্রেপ্তার 'নিষিদ্ধ'?

কী কাণ্ড!

সে দিন নাগরাকাটা রেল স্টেশনের একটু আগে লাইনের ধারে সক্কাল সক্কাল পড়ে থাকতে দেখা গেল বস্তা বোঝাই দামি জামাকাপড়। বাক্স বোঝাই টিভি। সব নতুন।

দামি ব্র্যান্ডের। এর পরে কয়েকজন সেসব বস্তা আর বাক্স কুড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। নিলও তা-ই। অতঃপর পুলিশের আগমন এবং সবকিছু বাজেয়াপ্তকরণ। যারা নিয়ে গিয়েছিল, তাদের পাকড়াওকরণ এবং দ্রব্য উদ্ধার। কিন্তু এসব বস্তু এল কোত্থেকে? জোর অনুমান, রেলের ওয়াগন বোঝাই হয়ে এসব বস্তু যাচ্ছিল আসামের দিকে। চুরির উদ্দেশ্যে কেউ এসব ওয়াগনের দরজা খুলে বাইরে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গীরা সেসব কুড়িয়ে নিতে পারেনি। একটু আগে চাপড়ামারির জঙ্গলে ফেলতে গিয়ে বোধহয় টাইমিং-এর ভুলে নাগরাকাটা স্টেশনের আগে ফেলে গিয়েছে। যাচ্চলে! ডুয়ার্সে ওয়াগন ব্রেকিং! কী কাণ্ড রে বাপোই!

টুক্রাণু

জলদাপাড়ায় সাত-সাতজন চোরা গাছ-কাটিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। জয়গাঁওতে বাজার পুড়ে ছাই। দিনহাটার কাছে বসকোটাল সীমান্তে একশো কেজি গাঁজা পাকড়েছে বিএসএফ। তিস্তায় জল নেই। ডুয়ার্স আর বাংলাদেশের মাথায় হাত! শিলিগুড়িতে খুনখারাপি আচমকা বেড়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সের বিচ্ছু হাতি বাঁয়া গণেশ এখন নাগরাকাটা কাঁপাচ্ছে। ন্যাওড়া ভ্যালির জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে বাঘের চরণচিহ্ন। উত্তেজনায় বন দপ্তরের চোখে ঘুম নেই।

ডুয়ার্স ব্যুরো

জলাভাবে ধুঁকছে আত্রেয়ী নদী সৌজন্যে বাংলাদেশ

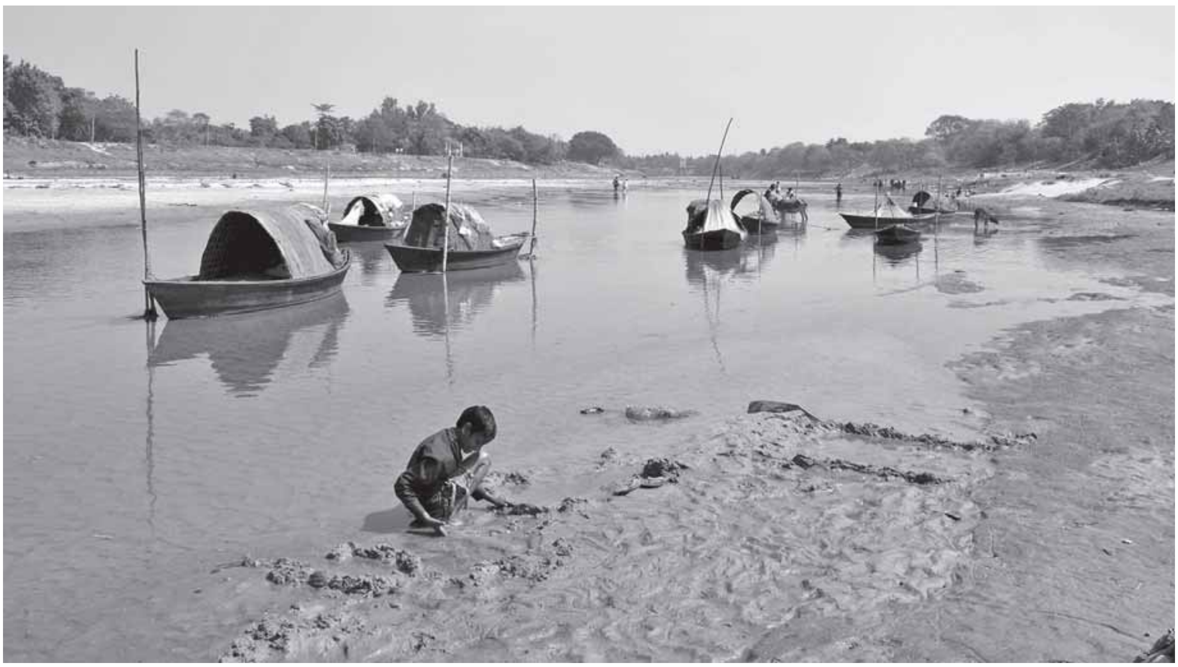

আত্রেয়ী শুধু একটি নদী নয়। আত্রেয়ী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর জীবনের নাম। যে জীবন জড়িয়ে আছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষের দৈনন্দিনতায়, কৃষকের ফসলে, মৎস্যজীবীদের জীবিকায়, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর সৃষ্টিতে। আত্রেয়ী আসলে চলমানতার প্রতীক। কিন্তু সেই প্রবহমানতা যেন রুদ্ধ। যে আত্রেয়ী খন গাইত, সে এখন উপহার দিচ্ছে মড়াকান্না। কিন্তু কেন? জেলার প্রধান নদীতে জল নেই। নদীখাত শুকিয়ে গিয়েছে। কোথাও যদি বা পা ডোবার মতো জল রয়েছে, তা-ও দূষিত। যে আত্রেয়ী নদী রাইখর মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল, কোথায় সেই মাছ? গোদের উপর বিষফোড়ার মতো জুড়েছে বালুরঘাট-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে মোহনপুরায় তৈরি একটি রবার বাঁধ। সীমান্ত থেকে ১৪০০ মিটার দূরে আন্তর্জাতিক নদী বলে স্বীকৃত আত্রেয়ীর উপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তৈরি ওই বাঁধ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। কৃষিনির্ভর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমগ্র অর্থনীতিকে করেছে বিপর্যস্ত। প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বিপন্ন। জেলাবাসী আত্রেয়ীর এই পরিস্থিতিকে জেলার প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করছেন।

ঘটনার শুরু যেখানে

একটু পিছিয়ে যেতেই হয়। প্রায় এক বছর এক মাস আগের ঘটনা। শিক্ষক-সহকর্মী মারফত খবর পেলাম, বাংলাদেশ নাকি আত্রেয়ী নদীর ভারতে প্রবেশ করার ঠিক আগ-মুহূর্তে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের প্রয়োজনমতো কখনও জল আটকে রাখছে, কখনও ছাড়ছে। ফলে সমস্যায় পড়ছে কৃষকরা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সমজিয়া (কুমারগঞ্জ ব্লক, যেখান দিয়ে আত্রেয়ী নদী ভারতে প্রবেশ করেছে) সীমান্তের দেড় কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ একটা রাবার ড্যাম দিয়েছে, যেটা আত্রেয়ীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেচ দপ্তর সত্যতা জানাতে পারল না, আরএলআই (রিভার লিফ্‌ট ইরিগেশন) দপ্তর সরকারিভাবে উত্তর দিল, খোঁজ নিয়ে দেখছি। দ্বারস্থ হওয়া গেল উপগ্রহচিত্রের। এবং সমস্ত আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে দেখা গেল, দিনাজপুর-ফুলবাড়ি ব্রিজের কাছে একটি রাবার ড্যাম (বিশেষ চিনা পদ্ধতিতে তৈরি) এই ঘটনাটি ঘটাচ্ছে।

কিন্তু তারপর?

প্রথমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসক এবং সরাসরি সেই রাবার ড্যামটির ছবিসহ ২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখ মেল করা হল বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরকে। এর পর করা হল পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রীর কাছে। পত্রপত্রিকায় খবর দেখে খোঁজ নিলেন স্থানীয় পূর্ত মন্ত্রী। জানলেন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী— ইমেল-ফ্যাক্সের মাধ্যমে। রাজ্যের বিধানসভা উত্তাল হল। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন, 'আত্রেয়ীতে বাঁধ কেন?' দেশে নদী সংক্রান্ত ঘরোয়া বৈঠকে আত্রেয়ী নদীর প্রসঙ্গ উঠবে স্থির হল।

বালুরঘাটে তরুণ-তরুণী, নাট্যকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাধারণ মানুষ, পরিবেশপ্রেমী, ছাত্রছাত্রীরা গান গাইল, পথনাটক করল, হল আলোচনাসভা আর চলতে থাকল জনমত সংগ্রহের কাজ। এ কাজে পথ দেখাল পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্প। 'আত্রেয়ী বাঁচাও' আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতি মাসের ২৯ তারিখ বর্ষব্যাপী নদী সংরক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেহেতু ২৯ তারিখেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

সমস্যা এক নয়, বহু

নদী নয়, আত্রেয়ী আজ একটি ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। শহরের বর্জ্য বেশির ভাগই ননবায়োডিগ্রেডেবল, মিশছে নদীতে। শহরের বেসরকারি নার্সিং হোম তাদের চিকিৎসাজনিত বর্জ্য ফেলছে, নদীর বুকে চাষবাস হচ্ছে। ফলে জলে মিশছে কীটনাশক। নদীপারের শ্মশানগুলি থেকে বর্জ্য মিশছে জলে। প্রতিমার গায়ে রঙের সঙ্গে মিশে থাকা ল্যাকার, ক্রোমিয়াম, হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম, লেড মিশছে। তৈরি হচ্ছে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা (বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)-জনিত সমস্যা। ফলে সমস্যায় পড়ছে মাছেরা। এত কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মাছেদের আর দেখা মিলছে না। রাইখর মাছের স্বাদ কিঞ্চিৎ কমেছে, আকৃতিও। কোথায় গেল বাঘা আড়, মহাশোল? চেলারা নির্বংশ হয়েছে প্রায়। বেলে, চাঁদা, খলসে প্রায় লুপ্ত। শুধু ময়া, পুঁটি, ট্যাংরা, বোয়ালরা এখনও টিমটিম করে রয়েছে।

কী বলছেন মৎস্যজীবীরা?

খিদিরপুর হালদারপাড়ার মৎস্যজীবী রমণ হালদার, রঞ্জিত হালদার, শ্যামল হালদার জানালেন, 'এখন মাছ কোথায়? সারাদিন পরিশ্রমের পর অল্প কিছু মাছ। তা দিয়ে হয় না। আগের মতো আর মাছ নেই। আমাদের ছেলেপুলেরা আর এ জীবিকায় থাকছে না। আমরা ভাল নেই।' এ কথা বলছেন হালদারপাড়ার সবাই। জল নেই, মাছ নেই, নদী ভাল নেই।

কৃষকরা কী বলছেন?

আত্রেয়ী ট্রান্সবাউন্ডারি নদী। যে নদী দুই বা ততোধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে ট্রান্সবাউন্ডারি নদী বলে। আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। আত্রেয়ীর মোট গতিপথ ৩৯০ কিলোমিটার। তার মধ্যে ভারতে অর্থাৎ দক্ষিণ দিনাজপুরে এর দৈর্ঘ্য ৫৫ কিলোমিটার। সর্বাধিক গভীরতা যে নদীর ৯৯ ফুট অর্থাৎ ৩০ মিটার, সেই নদী আজ গভীরতাহীন। বন্যা যে নদীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানে আজ জল নেই। কৃষকরাও একই কথা বলছেন। সমজিয়ার সুদাম দাস, দাউদপুরের রহমত আলি, রসুলপুরের শ্যামল কর্মকার, বেলডারার টিংকু রায়, পরানপুরের মিলন সরকার, মহীনগরের ভুতু পাল— সকলেরই একই কথা। নদীতে আগের মতো জল নেই আর। আত্রেয়ী নদীর উল্লেখ আছে মহাভারতে। অতীতে এই নদীর গুরুত্ব ছিল ব্যাপক। বড় বড় বাণিজ্যতরি, বজরা চলত এই নদীর বুকে। সেখানে কৃষকরা আজ হা-হুতাশ করছেন জলের অভাবে। নদী শুকিয়ে মাঠ।

অতীত-বর্তমান কথা

আত্রেয়ী এক সময় তিস্তা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তখন এর গুরুত্বই ছিল আলাদা। ১৭৮৭ সাল নাগাদ যখন তিস্তা তার পুরনো খাত পরিবর্তন করে নতুন খাতে বইতে শুরু করল, তখন আত্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হল বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এটাও ঠিক, এখন আত্রেয়ীর যে অবস্থা তা ঠিক পাঁচ বছর আগেও ছিল না। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়েও কমবেশি জল থাকত। মাছ পাওয়া যেত অনেক। মৎস্যজীবীরা জীবিকা নির্বাহ করতেন নদীর উপর নির্ভর করেই, যে নদীর উৎস হিসাবে উইকিপিডিয়া বলছে জোড়াপানি নদী। সংযুক্ত ছিল ফুলেশ্বরী ও করতোয়ার সঙ্গে। তারপর দিনাজপুর (বাংলাদেশ) ও ভারতের কুমারগঞ্জ ব্লক (প্রবাহপথ ৩৩ কিমি) ও বালুরঘাট ব্লক (প্রবাহপথ ২২ কিমি)-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং পড়েছে চলনবিলে, সে নদী কি তাহলে মারা যাবে? বাংলাদেশের বাঁধ প্রসঙ্গেই বা কী বলছে সেচ দপ্তর? কী বলছেন স্থানীয় অধিবাসী তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রী?

প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া

সেচ দপ্তরের নির্বাহী আধিকারিক সুনীল ঠাকুর জানালেন, বাংলাদেশের বাঁধ দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল জেলায় এসে পরিস্থিতি দেখে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। যেহেতু বিষয়টি দু'দেশের ব্যাপার, তাই কেন্দ্রীয় সরকারই বিষয়টি দেখছে। আর নদীর বুকে যে চাষবাস হচ্ছে, কলাবাগান ইত্যাদি লাগানো হচ্ছে, সেটা ভূমিসংস্কার দপ্তরের ব্যাপার। তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীর কথা কিন্তু পরিষ্কার। তাঁর মতে, আত্রেয়ীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমার যা যা করণীয় তা করব। আত্রেয়ীকে নষ্ট হতে দেব না।

আত্রেয়ী এখন

যদি দক্ষিণ দিনাজপুরে আত্রেয়ী নদীর প্রবেশপথ থেকে ধরা যায় তাহলে সমজিয়া-কৃষ্ণপুর-দাউদপুর-কুমারগঞ্জ-বেলডারা-পতিরাম-পাগলিগঞ্জ-পরানপুর-মহীনগর-রঘুনাথপুর-বালুরঘাট সদর-খিদিরপুর শ্মশানঘাট-হালদারপাড়া-ফতেপুর (এখান থেকে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে) কোথাও জল নেই আগের মতো। কোথাও শুকিয়ে কার্যত মাঠ। দিশারী সংকল্পর খুদে পরিবেশবন্ধুরা নদীর বুকে ক্রিকেট খেলে প্রতীকী প্রতিবাদও করেছে।

আত্রেয়ী নদীকে ঘিরে দাবি

পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্প দাবি তুলেছে—

- আত্রেয়ীতে ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়াতে হবে।
- আত্রেয়ীর দূষণ মোকাবিলা করতে হবে। শুধু আত্রেয়ী নদীরই নয়, আত্রেয়ী বা ডাঙা খাঁড়ির ক্ষেত্রেও তা করতে হবে। অর্থাৎ নাব্যতা বৃদ্ধি এবং দূষণ মোকাবিলা।
- আত্রেয়ী অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করতে হবে।
- আত্রেয়ীর মৎস্যসম্পদকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- আত্রেয়ীর বুকে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পুনশ্চ

আত্রেয়ী নদীর ভয়াবহ দুরবস্থার কথা ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল রিভার নেটওয়ার্ককে। বাংলাদেশের পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে যৌথ নদী সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াসমূহ শুরু হয়েছে। আত্রেয়ীকে বাঁচাতে হবে— এ লক্ষ্য তো একদিনে পূরণ হবে না। এ এক নিরন্তর লড়াই। সফলতা নিশ্চয়ই আসবে।

তুহিন শুভ্র মণ্ডল

ছবি: মৃদুল হোড়

লেখক পরিবেশবিদ। পরিবেশ-শিক্ষা প্রসারে পুরস্কারপ্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী।

অফ ইয়ারেও মালদায় আমের রেকর্ড ফলন

রেকর্ড ফলন হলে চাষিরা দাম পায় না। আবার গ্রীষ্মের দাবদাহে গুটি নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় পড়েন আম চাষিরা। গত কয়েক বছর যাবৎ এই হল মালদার আম আখ্যান। কুয়াশার কারণে মরশুমের প্রথম দিকে সমস্যা ছিল মুকুল নিয়ে। টানা তিন সপ্তাহ কুয়াশা ঘন থাকায় আম গাছে মুকুল আসছিল না। পরে দেখা গেল, সে সমস্যা অনেকটাই কেটেছে ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ একেবারেই না থাকায়। মুকুল দেরিতে এলেও ঝড়বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অধিকাংশ মুকুল থেকেই গাছে আমের গুটি ধরেছে। প্রসঙ্গত, অন্য জেলার তুলনায় মালদায় আম আসে দেরিতে আবহাওয়ার কারণেই। কিন্তু এবার প্রবল দাবদাহের জেরে আমের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মালদার আমচাষিরা উদ্‌বিগ্ন।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে দাবদাহ। তাতে মালদার বেশ কয়েকটি বাগানের আম গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনও কোনও বাগানের অপেক্ষাকৃত বড় আম সূর্যের প্রখর তাপে ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু এ বছর মালদায় আমের রেকর্ড ফলন হবে— এ কথা আগেই জানিয়েছিল জেলা উদ্যান পালন দপ্তর। ওই সূত্রেই জানা যায়, জেলায় প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। জেলার প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ আম চাষের সঙ্গে জড়িত। আম বিপুল পরিমাণে হয় পুরাতন মালদা, কালিয়াচক ১, ২, ৩ নং ব্লক, ইংরেজবাজার, মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুরসহ আরও কয়েকটি ব্লকে। উদ্যান পালন দপ্তরের কথামতো মার্চ ও এপ্রিল মাসের গোড়াতেও মালদার আমচাষি ও ব্যবসায়ীরা আশার আলো দেখেছিলেন। অধিক ফলন হওয়ার সম্ভাবনাকে আরও বেশি লাভের অঙ্কে দেখতেও শুরু করেছিলেন তারা। কিন্তু এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে মে মাসের একেবারে গোড়ায় তাপমাত্রা ৪০-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলাচল করতে শুরু করে। প্রবল দাবদাহে বেশ কিছু গাছে আম শুকিয়ে যায় কিংবা ফেটে যায়।

তবে চাষিদের এই আশঙ্কাকে অমূলক বলছেন জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক রাহুল চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, প্রবল দাবদাহ মালদা জেলায় নতুন ঘটনা নয়, আর সেটা আমের পক্ষে দারুণ ক্ষতি ঘটাবে এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। মালদায় প্রায় ৬৫ শতাংশ আমবাগানই অধিক ফলনশীল। এর মধ্যে অধিকাংশ বাগানেই আছে সেচের ব্যবস্থা। যেখানে সেচ রয়েছে, সেখানে বিকেলের পর গাছে জল ছেটাতে এবং বাষ্পমোচন প্রতিরোধকারী স্প্রে ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে উদ্যান পালন দপ্তর। যেখানে সেচব্যবস্থা নেই, সেখানে সমস্যা হলেও বড় আকার নেবে না বলেই দপ্তরের ধারণা।

ইতিমধ্যে আমচাষিদের মধ্যে সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকল্প শুরু হয়েছে। মালদা জেলা আম ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি উজ্জ্বল চৌধুরী জানালেন, দাবদাহ একটা সমস্যা ঠিকই। এতে কিছু ফসলের ক্ষতি হবে। কিন্তু এবার কম উৎপাদন বর্ষের হিসেবেও অনেক বেশি ফলন হবে। তাই ক্ষতি যেটুকু হবে তা পুষিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কম ও বেশি— এই দু'ধরনের ফলন বর্ষের হিসেবে চালু আছে। অর্থাৎ যে বছর খুব বেশি ফলন হয়, তার পরের বার গাছ কম ফলন দেয়। গত বছর (২০১৫) আমের রেকর্ড ফলন হয়েছিল। সেই হিসেব অনুসারে এবার 'অফ ইয়ার', মানে কম ফলনের বছর। কিন্তু গুটি আসার পরই বোঝা গিয়েছিল,কম ফলনের বছরও রেকর্ড ফলন হবে। উদ্যান পালন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ২০১৫ সালের থেকে মাত্র ৭৫ হাজার মেট্রিক টন কম ফলন হবে এবার, যা কম ফলন বর্ষের হিসেবেও অনেক বেশি। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছে দপ্তর। কর্তারা বলেন, এপ্রিল মাসেই মূলত ফলনের ক্ষতিকর শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী হয়। এইসব সমস্যার অধিকাংশই পেরিয়ে গিয়েছে। গুটি মজবুত হয়ে আম গাছে পাকতে শুরু করেছে। দাবদাহ সমস্যাও প্রায় অতিক্রান্ত। অতএব ফলন নিয়ে অহেতুক চিন্তার কোনও কারণ নেই। ২০১৫-১৬ বর্ষে বর্ষার মরশুমে ২০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে আমচাষ বৃদ্ধির জন্য ৪৫ হাজার চারা বিলি হয়েছে। আম বাঁচাতে বিভিন্ন ব্লকে শিবির করে আমচাষিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জেলা উদ্যান পালন দপ্তর জানাচ্ছে, মালদায় এবার এক লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি আম উৎপাদন হবে।

সন্দীপ কাঞ্জিলাল

বিলুপ্তির পথে বালাস গ্রামের কাঠপুতুল নাচ

জেলার গ্রাম্য সংস্কৃতির মানচিত্রে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির অন্যতম আঙ্গিক পুতুলনাচের সন্ধান পাওয়া যায় কালিয়াগঞ্জ থেকে ১০ কিমি দূরে। একদা পুতুলনাচের জন্য বিখ্যাত ছিল বালাস গ্রাম। গ্রামের মানুষরা তাঁদের কাঠের পুতুল দিয়ে শুধু উত্তর দিনাজপুর জেলাই নয়, পার্শ্ববর্তী জেলার গ্রামের মানুষকেও আনন্দ দিতেন। আজও তাঁরা সেই গ্রামেই আছেন, আছে তাঁদের কাঠপুতুল। তবে পুতুলগুলি হারিয়েছে সে দিনের জৌলুস।

বিগত দিনের স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে প্রবীণ পুতুলনাচ শিল্পী হরগোবিন্দ দেবশর্মা জানান, বালাস গ্রামের এই পুতুলনাচ একটা সময় শুধু জেলায় নয়, সারা রাজ্যের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তখন পুতুলনাচের জনপ্রিয় পালা ছিল 'শকুন্তলা', 'লায়লা মজনু', 'ভক্ত প্রহ্লাদ', 'রাজা হরিশচন্দ্র'— আরও কত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আখ্যান। আজ আর সেই পুতুলনাচ নেই, আছে শুধু একরাশ বেদনা। বালাস গ্রামেরই শিল্পী ভান্ডারু দেবশর্মা বলেন, একটা সময় ছিল, যখন এই গ্রামের শিল্পীরাই একত্রিত হয়ে কাঠের পুতুল তৈরি করে পুতুলনাচের আসর বসাত গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন মেলায়। যা রোজগার হত তা দিয়েই সারা বছর তাদের চলে যেত। ফলে কয়েক যুগ ধরে বংশপরম্পরায় পুতুলনাচই হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন-জীবিকা।

সময়ের পরিবর্তনে বিনোদনজগতেও ঘটে গিয়েছে বিপুল রদবদল। নানা মাধ্যমে এবং উপাদানে বিনোদন এখন পৌঁছে গিয়েছে মানুষের ঘরে ঘরে। ফলে পুতুলনাচে মানুষ আজ আর তেমন উৎসাহী নয়। কমতে কমতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে পুতুলনাচের কদর। জেলার লোকসংস্কৃতি গবেষকদের বক্তব্য, সময় পালটালেও পুতুল নির্মাণ, এমনকি নাচ পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ঘটেনি। বাধ্য হয়ে রুটিরুজির তাগিদে গ্রামের শিল্পীরা পুতুলনাচ দেখানো বাদ দিয়ে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকেছেন। বালাস গ্রামের পুতুলনাচ শিল্পী বাবলু সরকার জানান, এক সময় রাশিয়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ তারা পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোক যেতে না দেওয়ায় তাদের আর যাওয়া হয়নি। সরকারের তরফেও পুতুলনাচ ও তার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিয়ে উদাসীন। এই পুতুলনাচকে বাঁচাতে সরকার কোনও দিনই এগিয়ে আসেনি।

তন্ময় চক্রবর্তী

দেবপ্রসাদ রায়

বোমা তৈরির মশলা তখন চলতি কথায় লাল-সাদা নামেই পরিচিত ছিল। ডুয়ার্সে সে মশলা নাকি তখন মিলত বক্সির হাটে। রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা মাঝেমধ্যে অস্তিত্ব জানান দিত সেইসব বোমার মাধ্যমে। কখনও কখনও বোমা তৈরির বিশেষজ্ঞরা বাইরে থেকে এসেও প্রশিক্ষণ দিত। জ্যোতি বসুর মিটিং পণ্ড করতে নাকি একবার এমন কৌশল নিতে হয়েছিল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। সেই ঘটনার থেকে অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক ছিল বক্সির হাট থেকে বোমার মশলা কিনে অ্যাটাচিতে ভরে নিয়ে আসা। একই বাসে পাশাপাশি বোমা তৈরির মশলাবাহক লেখক এবং পুলিশের এসআই। প্রবীণ রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত কলামে এমন বহু ঘটনাই অসাধারণ মাত্রা নিয়েছে, যেগুলি গত শতকের রাজনৈতিক দলিলও বটে।

১০

জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া তোড়লপাড়ায় শ্যাম ব্যাপারী নামের একজনকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা আগে ঘটেছিল। কংগ্রেস করার অপরাধে শ্যাম ব্যাপারীকে উচ্ছেদ করে অতুল বিশ্বাস নামক এক 'কমরেড'। শ্যামকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে কি যাবে না— এ নিয়ে তখন আলোচনা চলছে। তেজেন রায় নামে এক ভদ্রলোক তখন আমাদের হয়ে তোড়লপাড়ায় সংগঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সম্পন্ন পরিবারের ব্যক্তি তেজেনবাবু সেখানকার কিছু ছেলেকে আমাদের দলে নিয়ে আসায় পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি এলাকায় আমাদের বেশ ভাল একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যেই। ছানুদা, মনু, অধীর ক্ষীরবল, জগন্নাথ— এঁরা সেখানে দলের হয়ে কাজ করতেন বলে মনে পড়ছে। জগন্নাথকে অবশ্য নকশালরা পরে খুন করেছিল। ফলে শ্যাম ব্যাপারীর কেসটা নিয়ে সেখানে একটা সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল সে সময়ে। তেজেনদা প্রায়ই বলতেন, 'যুদ্ধ কিন্তু একটা হবেই!'

আমরা সন্ধে নাগাদ প্রায় দিনই সাইকেল চালিয়ে কালীবাড়ির কাছে তৈরি করা পার্টি অফিসে চলে আসতাম। আমার সঙ্গে প্রায়ই শেখর থাকত। তোড়লপাড়া এলাকায় কংগ্রেসের একটা নিউক্লিয়াস গঠিত হচ্ছিল মনে আছে। এক সন্ধ্যায় তেজেনদা পার্টি অফিসে আলোচনার ফাঁকে জানালেন যে, যুদ্ধ যখন হচ্ছেই, তখন তৈরি থাকা ভাল। সে সময় অবধি আমাদের লড়াই-ঝগড়ার মূল অস্ত্র ছিল হকি স্টিক। শম্ভুদার পরামর্শে বেশ কিছু হকি স্টিক কিনে মজুত করে রেখেছিলাম আমরা। বস্তুত রাজনৈতিক সংঘর্ষে ওটাই ছিল সবার অস্ত্র এবং তা নিয়ে রে রে করে তেড়ে যাওয়ার বেশি কিছু করতে পারতাম না আমরা।

তেজেনদার কথায় আমি জানালাম, 'তৈরি থাকতে হবে।'

বললাম তো বটে। কিন্তু তৈরি হব কীভাবে? আলিপুরদুয়ারে আমাদের ছেলেরা অবশ্য যথেষ্ট বলশালী এবং যুদ্ধবিশারদ ছিল। বোমা বানাবার কৌশলও রপ্ত করে ফেলেছিল তারা। কারণ, জ্যোতি বসুর মিটিং পণ্ড করার পর ওইসব গোলাবারুদ ছাড়া তাদের পক্ষে আলিপুরে অস্তিত্ব বজায় রাখা খুব শক্ত হয়ে পড়েছিল তখন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে, আলিপুরদুয়ার থেকে বিশারদ নিয়ে এসে আমাদের বোমা ইত্যাদি তৈরি করিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা আলিপুরদুয়ারকে অনুরোধ করলাম একটু 'হেল্প' করার জন্য। ওরা জানাল, 'আমরা বোমা বাঁধার লোক দিতে পারি, কিন্তু মাল মশলা তোমাদেরই জোগাড় করে দিতে হবে।'

বোমা তৈরির মশলা তখন চলতি কথায় 'লাল-সাদা' নামে পরিচিত। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সে মশলা মিলবে বক্সির হাটে। আমি একটা দেওয়ালির দিন সুটকেস নিয়ে হাজির হলাম বক্সির হাটে। মশলা কিনে অ্যাটাচিতে ভরে বাসে করে ফিরছি, আর পাশে এসে বসেছেন পুলিশের একজন

হাসপাতালে আমাদের ঢুকতে দেখে গোপাল ভাবল ওকে বোধহয় আমরা সাহায্য করতে এসেছি। তাই ও গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। আমরাও নেমে পড়েছি। কিন্তু শম্ভুদা আচমকা ‘এই শালা!’ বলে গোপালকে ধরে সোজা গাড়িতে তুলে এনে সাঁই সাঁই করে অকুস্থল থেকে উধাও হয়ে গেলেন। আমি সুবলদা, মানদাক্ষী, নন্দদুলাল সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই শম্ভুদার গাড়ি গোপালকে নিয়ে মিলিয়ে গেল।

এসআই। কিছু বললে আহত তো হবই, গ্রেপ্তারও হব। তা ফিরে আসা নির্বিঘ্নেই হল। আমি কিলো দুয়েক লাল-সাদা কিনে এনেছিলাম প্রায় আটশো টাকা দিয়ে। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার থেকে অজিত আর হরি বলে দুই বোমা বিশেষজ্ঞ চলে এসেছে। কালী পুজোর রাতে ওরা দু’জন বসে বসে বোমা বাঁধল। আমরা দেখলাম গোটা কুড়ি বোমা তৈরি হয়েছে।

তেজেনদার ‘যুদ্ধ লাগা’র অনুমান সত্যি প্রমাণ করে একদিন সিপিএম টাঙ্গি, বল্লম— এসব নিয়ে আমাদের পান্ডাপাড়ার অফিসে হামলা করতে এল। তখন আমি ছিলাম না। পরে শুনেছি যে, তেজেনদার মতো ধুতি পরা কোর্টের ডিড রাইটার যখন দেখল আমাদের উপস্থিত সেনাবাহিনী অর্থাৎ মনু, অজিত, জগন্নাথ— এরা কেউই যখন বোমা ছোড়ার সাহস দেখাতে পারছে না, তখন তিনি নিজেই একটা তুলে নিয়ে আক্রমণকারীদের দিকে অবলীলায় নিক্ষেপ করলেন। সেটা বিকট শব্দে ফাটল। তেজেনদার ভাষায়, ‘আমিই একটা ছুড়ে দিলাম বুঝলি? সেটা দিম করে ফাটল। একটু আগুনও বার হইল। আর ওরা সেই যে ভাগল, আর ত্রিসীমানায় কারোরে দ্যাখলাম না!’

এসব গোপাল ঘোষের ইলেকশনের জিপ নিয়ে উধাও হওয়ার আগের ঘটনা এবং সেই কারণে পরিস্থিতি বেশ সংঘাতপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে যখন পুলিশের ফোন এল, আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। খবর পেয়ে শম্ভু মুখার্জি এলেন। তিনি হুকুম দিলেন সবাইকে গাড়িতে উঠতে এবং আরও বললেন, ‘সবাই একটা করে হকি স্টিক নাও। গিয়েই গোপালকে দমাদ্দম পেটাতে শুরু করবে।’

আমি ভাবলাম, হয় আমাকে পরে গোপালের অথবা এখন শম্ভুদার মার খেতে হবে। তা আগে বর্তমানটাই সামলাই। ফলে একটা হকি স্টিক বাগিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। গোপালের তাণ্ডব দেখে হাসপাতালের ডাক্তাররা এর মধ্যে অনুপমদাকে ফোন করেছিল। অনুপমদা আমাদের ফোনে জানিয়ে দিলেন যে, হয় কিছু একটা করতে, নয়ত পরের দিন অনুপমদা প্রার্থীপদ ত্যাগ করে সরে দাঁড়াবেন।

অনুপমদাকে আমরা বিধানসভায় বিস্তর লড়াই করে দাঁড় করিয়েছিলাম। এর মধ্যে অনশনও করতে হয়েছিল আমাদের। ফলে সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠল। শম্ভুদার নেতৃত্বে আমরা জনা পাঁচেক চললাম হাসপাতালের দিকে। গাড়ি শম্ভুদাই চালাচ্ছিলেন।

হাসপাতালে আমাদের ঢুকতে দেখে গোপাল ভাবল ওকে বোধহয় আমরা সাহায্য করতে এসেছি। তাই ও গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। আমরাও নেমে পড়েছি। কিন্তু শম্ভুদা আচমকা ‘এই শালা!’ বলে গোপালকে ধরে সোজা গাড়িতে তুলে এনে সাঁই সাঁই করে অকুস্থল থেকে উধাও হয়ে গেলেন। আমি সুবলদা, মানদাক্ষী, নন্দদুলাল— সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই শম্ভুদার গাড়ি গোপালকে নিয়ে মিলিয়ে গেল।

এর পরেই দেখলাম একটা ট্রাকে চেপে অনেক লোক হাসপাতালে ঢুকছে আর তাদের মুখে ভয়াবহ হুংকার। ‘মার! মার! মার!’

মনে হল ‘মার’ ধ্বনির লক্ষ্য আমরাই। বিলম্ব না করে হকি স্টিক ফেলে প্রচণ্ড জোরে ছুটলাম সবাই। সুবলদা একটা পরিত্যক্ত অ্যাম্বুলেন্সে সেঁধিয়ে গেলেন। মার খাওয়ার প্রাথমিক আশঙ্কা কাটিয়ে আমি আর নন্দদুলাল হাসপাতালের পিছনে এসে কী করা যায় ভাবছি। সঙ্গে মানিক পাগলা বলে ছিল একজন। নন্দদুলাল বুদ্ধি দিল, ‘চল! ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে যাই।’

তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। আমি বললাম, ‘এই রাতে ফিমেল ওয়ার্ডে আশ্রয় নিলে মার খাওয়া এমনিতেই অনিবার্য হয়ে যাবে।’

অতঃপর আমি আর মানিক পাগলা মর্গের পিছনে সেফটি ট্যাঙ্কের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নন্দদুলাল প্রবল আত্মবিশ্বাসে ফিমেল ওয়ার্ডেই গেল। সামনেই করলা নদী। তখন মনে হচ্ছিল, সাঁতার জানলে তক্ষুনি নদী পেরিয়ে দিনবাজারে চলে যেতাম। এদিকে সেখানে দাঁড়ানোমাত্রই গোটা পাঁচেক কুকুর প্রবল চিৎকার করে আমাদের প্রায় ঘিরে ফেলেছে। দেখে মনে হচ্ছে একসঙ্গে কামড়ানোর প্ল্যান আঁটছে। কুকুরদের সেই তারস্বরে চিৎকারের ফাঁক দিয়েই আমি শুনলাম মানিক পাগলা বলছে, ‘চিন্তা করিস না। মরলে দু’জনেই একসঙ্গে মরব।’

আমি বললাম, ‘মরলে তো মরেই গেলাম। বাঁচব কী করে, সেটা ভাবো।’

খানিক বাদে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কুকুরের কামড় খাওয়ার বদলে ফিরে যাওয়াই ভাল। দু’জনে আবার ফিরে এলাম হাসপাতালের সামনে। দেখলাম পরিস্থিতি বেশ শান্ত, কেবল ডাক্তাররা প্রচণ্ড উত্তেজিত। শম্ভুদাকেও আবিষ্কার করলাম জিপ নিয়ে ফিরে এসেছে। তিনি আমাদের দেখেই বললেন, ‘সে কী? তোরা তখন উঠতে পারিসনি?

‘উঠতে পারিসনি মানে? ওঠার আগেই তো গাড়ি নিয়ে চলে গেলে তুমি!’

‘আমি তো ভাবলাম উঠে গিয়েছিস।’

আসলে সেই ‘মার’ ধ্বনি শুনে শম্ভুদাও তখন কোনও ঝুঁকি নেননি। কিন্তু সেটা তো আর বলা যায় না!

জানা গেল যে, শম্ভুদা গোপালকে সোজা থানায় জমা করে বলে এসেছেন— ভোটের আগে যেন তাকে না ছাড়া হয়। কিন্তু ট্রাকে করে মারতে আসার ব্যাপারটা জেনেছিলাম পরে। হাসপাতালে হানা দেওয়ার আগে গোপাল দু’নম্বর ঘুমটির ট্রাক স্ট্যান্ডে কয়েকজন ট্রাক ড্রাইভারকে অকারণে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পালিয়েছিল। ফলে ড্রাইভাররা একজোট হয়ে একটা ট্রাকে চেপে টাঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল গোপালকে। যখন শুনেছি হাসপাতালে একজন তাণ্ডব চালাচ্ছে, তখন বুঝে যাই গোপাল সেখানেই, এবং লোকগুলো প্রবল উৎসাহে তাকেই পেটাতে আসে। আমরা খামকা নিজেদের টার্গেট ভেবে চম্পট দিই।

গোপালকে থানায় দেওয়া হয়েছে জেনে ট্রাক ড্রাইভাররা শান্ত হয়ে চলে যায়। আমরাও ফিরে আসি। এসে দেখি অনুপমদা প্রচণ্ড উত্তেজিত।

ওই সময় শম্ভুদা আমাদের অনেক বল-ভরসা জোগাতেন বলে বেশ মনে আছে। স্মৃতি বড়ই বিচিত্র। একটা ঘটনা থেকে হঠাৎ মনে করিয়ে দেয় আরেকটা ঘটনা। সেটাও অনুপমদার সেই নির্বাচনের প্রাক্কালেই। আমি সে দিন প্রার্থীর সমর্থনে সোনাউল্লা স্কুলে দেয়াল লিখব বলে সবে কাজ শুরু করেছি।

(ক্রমশ)

তরাই উৎরাই

২৫

দু’দিন হল রাসপূর্ণিমা গিয়েছে। গগনেন্দ্র তাদের মাথাভাঙার বাড়িতে নিজের ঘরে। বাবা রাজীবলোচন মিত্র কোচবিহারে রওনা দেবেন আজকে। বাড়িতে সেই তোড়জোড় পূর্ণোদ্যমে চলছে। বাবা না ফেরা পর্যন্ত মাথাভাঙাতেই থাকতে হবে গগনেন্দ্রকে। তার মানে দিন পনেরোর ধাক্কা। বেশিও লাগতে পারে। ফলে গগনেন্দ্র বেশ উদ্‌বেগের মধ্যে থাকছে। পরের পূর্ণিমায় আলিপুরদুয়ারে থাকতে হবে। বাবা ফেরার পর হাতে কতটুকু সময় থাকবে, সেটাই মূল উদ্‌বেগ। হিদারুদার সঙ্গে প্ল্যান করার অনেক কিছু আছে। গতকালই তাকে মাথাভাঙায় আসার জন্য একটা চিঠি দিয়েছে ডাকে। সে চলে এলে দিনগুলো মন্দ কাটবে না মাথাভাঙায়। অবশ্য সময় কাটাবার হরেক জিনিস আছে এখানে। চাইলেই মানসাই পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে শিকার করা যায়। কোচম্যানকে বললেই গাড়ি জুতে দেবে। কয়েকটা বই আর কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল।

আগে হলে এসবই করত গগনেন্দ্র। কিন্তু এখন তার অবস্থা কিঞ্চিৎ এলোমেলো। সুযোগ পেলেই আলিপুরদুয়ারে উপেনের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা নিয়ে সে খুবই ভাবছে। কিন্তু সেই ভাবনার গভীরতার তল থেকে মাঝে মাঝেই উঠে আসছে এক কিশোরীর মুখ। ফলে আলিপুরদুয়ারের ভাবনায় বিরাট বিরাট ছেদ পড়ছে। গগনেন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করছে চিন্তাভাবনার জগতে আলিপুরদুয়ারকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু এই দশায় কোন পুরুষই বা সেটা পারবে?

রহস্য-রোমাঞ্চের অনেক কাহিনি পড়েছে সে। ইদানীং সে গল্পগুলোয় তার আসক্তি না থাকার কারণ কি আলিপুরদুয়ার? অনুসন্ধান করলে দেখা যেত যে, তার পক্ষে আলিপুরদুয়ারে পরের পূর্ণিমার আগে পৌঁছে কয়েকদিন কাটিয়ে আসাটা কোনও সমস্যাই নয়। কথাটা রাজীবলোচন মিত্রর কানে পৌঁছে দিলেই ব্যবস্থা হয়ে যেত অনায়াসে। তাই আলিপুরদুয়ার কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। তা সত্ত্বেও সমস্যা হচ্ছে কারণ, উক্ত কিশোরীর মুখ। সেই মুখ যখন এক চিলতে হাসি নিয়ে মানসপটে ভেসে ওঠে, তখন আলিপুরদুয়ার নিয়ে ভাবা যাবতীয় সিদ্ধান্ত চিরকালের মতো গুলিয়ে যায়। ফলে সব কিছু আবার ভাবতে হয় গোড়া থেকে। এখানে আসার আগে জামালদহে ব্যবসার কাজের বড় ধকল ছিল। শীত পড়ে যাওয়ার আগে এই ধকল অবশ্য নতুন কিছু নয়। সবাই জানে যে হিসেবের বড় বড় যোগ, শতকরা হিসেব পলকের মধ্যে নির্ভুল কষে ফেলতে পারে গগনেন্দ্র। এ যাত্রায় সেসব হিসেবের দু’-একটায় যে ভুল বেরিয়েছে। ক্যাশিয়ারবাবু বলেছিলেন, ‘বড্ড তাড়াহুড়ো করেছেন তো! অন্য কেউ হলে গাদা গাদা ভুল বার হত।’

কিন্তু তাড়াহুড়ো করাটাই কি কারণ? কমিশনের হিসেব কষে ফেলার ঠিক আগে কি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে

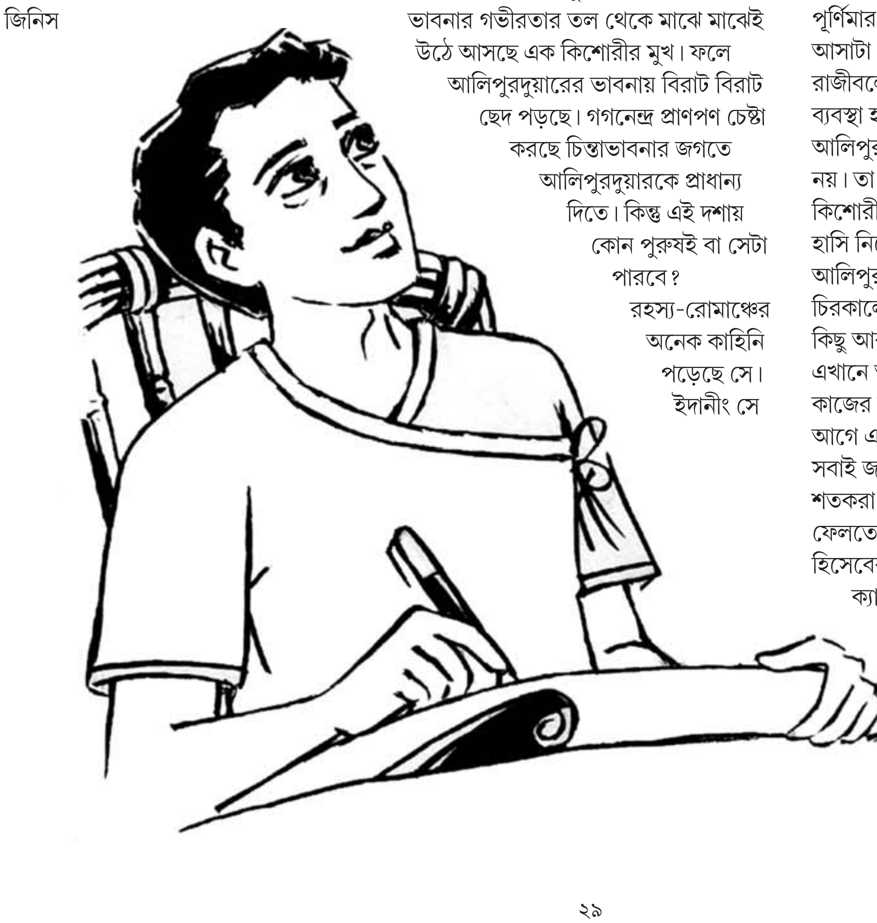

যায়নি সেই কিশোরী? গুদামে মালপত্র দেখতে গিয়ে কি লণ্ঠনের আলোয় পাঠরতা কিশোরীকে বসে থাকতে দেখেনি সে দিন? ফলে গুদামবাবুকে দু'বার করে সব বোঝাতে হয়েছিল। আর, সেই মুহূর্তে সে মাথাভাঙার বাড়িতে নিজের ঘরে একা একা বসে সত্যিই শুনতে পারছে বাবার রাসমেলা দেখতে যাওয়ার প্রস্তুতির কোলাহল। ঘরে কি অশরীরীর মতো এক নারীমূর্তি মাঝে মাঝেই আবির্ভূত হচ্ছে না?

রাজীবলোচন যাবেন আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। বাড়িতে তা-ই নিয়ে হুলুস্থুলু চলছে। বসার ঘরে যাত্রাবন্ধুরা সকলেই হাজির। বাড়ির বাইরে রাস্তায় গোরুর গাড়ি, কুলি, গাড়োয়ান দেখে মনে হচ্ছিল ছোটখাটো রেল স্টেশন। রান্নার লোক, বাসনপত্র, আবশ্যিক দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেপ-কম্বল— জিনিস তো কম যাচ্ছে না! তা ছাড়া মেলায় কেনাকাটা আছে। তার জন্য ফাঁকা গোরুর গাড়িও যাচ্ছে একাধিক। প্রস্তুতিও শেষের দিকে। যখন-তখন যাত্রা শুরু হবে।

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজতেই দেখা গেল, সবান্ধব রাজীবলোচন বার হচ্ছেন। গগনেন্দ্র তখন চোখের সামনে খুদিদার বাড়ির রাস্তাটা দেখছিল। সেই রাস্তায় পা দিলেই তার রোমাঞ্চ জাগে। এখনও তাকে দেখে তেমনই রোমাঞ্চিত মনে হচ্ছিল। শেষে বাইরে থেকে রাজীবলোচনের তৃতীয়বারের ডাক কানে আসতেই সে দৌড়াল সদর দরজার দিকে।

মাষকলাইবাড়িতে করলার ধারে শ্মশান এলাকাটা রীতিমতো জঙ্গল। দিনের বেলাতেই বাঘের যাওয়া-আসা, রাতে তো কথাই নেই। বেলা দ্বিপ্রহরেও রাস্তাটায় শ্মশানযাত্রী ছাড়া আর কোনও লোক না থাকায় মধুদাদের থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকা পুরোহিত বিদ্যা চক্রবর্তী হনহন করে হেঁটে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করছিলেন এতক্ষণ। এবার সেটা করতে পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'প্রসন্নদেবের মেয়ের বিয়ের তারিখটা কবে বলুন তো?'

দেখা গেল, তিনি তখনও দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। বাকিরা সবাই বাইরে। গগনেন্দ্র প্রণাম করে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?'

'আমি ফিরলে কি আবার জলপাইগুড়ি যাবি?' রাজীবলোচন স্মিত হেসে বললেন। গগনেন্দ্র বলে ফেলল, 'দিদি-জামাইবাবুকে তো বিজয়ার প্রণাম করা হল না।'

'তা ঠিক।' রাস পর্যন্ত বিজয়ার প্রণামের সময় থাকে কি না, সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বললেন রাজীবলোচন, 'মনে হয় দিন পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসব। বিজয়ার প্রণাম শীত পর্যন্ত করা যায়।'

ছেলের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজীবলোচন। বন্ধুদের মধ্যে কে জানি চেঁচিয়ে বলল, 'জয়! মদমমোহনের জয়!' জবাবে জয়ধ্বনির একটা সমবেত হুংকার শোনা গেল। গোটা পাড়া মুখরিত করে, অনেকগুলি উৎসাহী চোখের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল রাজীবলোচনের বাহিনী। তাঁর মুখটি তখন অতি প্রশান্ত। বন্ধুরা এই প্রশান্তির কারণ হিসেবে কোচবিহার ভ্রমণকে বিবেচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে গতকাল তাঁর কাছে একটা পত্র এসেছে জলপাইগুড়ি থেকে। প্রেরক গোপাল ঘোষ। সেই পত্রখানা পাঠ করে পুত্রের ঘন ঘন জলপাইগুড়ি যাওয়ার কারণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন রাজীবলোচন। দিদির বাড়ি যে উপলক্ষ তা আগেই অনুমান করেছিলেন। পত্রে বাকি যা জেনেছেন তা অতি মধুর লেগেছে রাজীবলোচনের। জবাবটাও লিখে পকেটে নিয়ে রওনা হয়েছেন কোচবিহারের দিকে। সেখানে গিয়ে ডাক দেবেন। তারপর যেতে হবে জলপাইগুড়ি। নিজের মেয়েকে সস্নেহ বকুনি দিয়ে একটা চিঠিও লিখতে হবে। এই ঘটনা মেয়ে জানে না তা হতেই পারে না। দিদিকে কি গগনেন্দ্র কোনও দিনও কিছু লুকিয়েছে?

ডুয়ার্সের আকাশ বড় পরিষ্কার আজ। মাথাভাঙার মতো জলপাইগুড়ি শহরেও উজ্জ্বল মনোরম রোদ্দুর। মধু দাশগুপ্ত এই চমৎকার সকালে শ্মশান থেকে ফিরছিলেন শবদাহ করে। এই কাজটায় তাঁর বেজায় উৎসাহ। এ পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে তিনি কত মড়া পুড়িয়েছেন, তার কোনও হিসেব নেই। লোকের ধারণা, হাজারখানেক তো ছাড়িয়েছেই। এমনিতে তিনি ইস্টার্ন টি কোম্পানির হেড আপিসের সেক্রেটারি। শিল্প সমিতি পাড়ায় করলার ধারে মধুবাবুর বাড়িতে রোজ আড়াই-তিনশো লোকের পাত পড়ে। তবে টাউনে তিনি জনপ্রিয় 'মোদ্দা' নামে। সেটা আসলে 'মধুদা'র ধ্বনি পরিবর্তন।

সঙ্গে কয়েকজন শাগরেদ ছিল। মধুদা তাদের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে ফিরছিলেন। মাষকলাইবাড়িতে করলার ধারে শ্মশান এলাকাটা রীতিমতো জঙ্গল। দিনের বেলাতেই বাঘের যাওয়া-আসা, রাতে তো কথাই নেই। বেলা দ্বিপ্রহরেও রাস্তাটায় শ্মশানযাত্রী ছাড়া আর কোনও লোক না থাকায় মধুদাদের থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকা পুরোহিত বিদ্যা চক্রবর্তী হনহন করে হেঁটে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করছিলেন এতক্ষণ। এবার সেটা করতে পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'প্রসন্নদেবের মেয়ের বিয়ের তারিখটা কবে বলুন তো?'

মধুদা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বক্তাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'বিয়ে তবে ঢাকার নিশি ডাক্তারের ছেলের সঙ্গেই হচ্ছে?'

'ওখানেই হচ্ছে। তা নিশিকান্তবাবু তো মন্ত্রী। কাজেই রাজকীয় ব্যাপারটা বজায় থাকছে। নেমন্তন্নর তালিকায় আপনার নাম আছে কিন্তু। আমি দেখেছি তালিকা।'

'আপনি?'

'আমিও আছি। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা মনে হচ্ছে আড়াই হাজার পেরিয়ে যাবে। তারিখটা হল বিশে ফাল্গুন। শুক্কুরবার।'

'তবে তো আর তিন মাসের মতো। কিন্তু এ বিয়েতে শুনলাম কোচবিহার রাজপরিবারের কেউ আসবে না।'

'কেন? সেখানেও তো নেমন্তন্ন যাচ্ছে!' চক্রবর্তী অবাক হন। মধুদা হাঁটার গতি কমিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'নিশি ডাক্তার হল পলিটিক্সের মন্ত্রী। রায়কত রাজাদের মধ্যে রাজবংশের বাইরে বিয়ে দেওয়ার চল নেই। এই কারণেই কোচবিহার রাজপরিবারের কেউ আসতে রাজি নয়। আমার কাছে এমন খবরই আছে।'

মধুবাবুর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চক্রবর্তী নীরবে হাঁটতে হাঁটতে কিছু ভাবলেন। শেষে বললেন, 'না এলেও কমিশনারের আপিস, পিডব্লুডি, ডুয়ার্স বোর্ড, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার— সব জায়গা থেকে লোকের নেমন্তন্ন। বেশ একটা উৎসব হবে, কী বলেন? এ জিনিস ছাড়া যায় না। রাজকন্যার বিয়ে বলে কথা। এমন নেমন্তন্ন জীবনে ক'টা জোটে!'

মধুবাবু এক প্রস্থ হেসে বললেন, 'আমিও তা-ই ভাবছি।'

তখনই উলটো দিক থেকে হরিধ্বনি তুলে শববাহকদের আসতে দেখা গেল। মধু দাশগুপ্ত থমকে দাঁড়ালেন। পিছনে ফেলে আসা শ্মশানভূমি আবার টানতে শুরু করল তাঁকে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহিত মহিলার নীল ভিডিয়ো এখন বেশি চাইছে এ দেশের দর্শকরা। আর ওইসব ছবির সুপারহিট নায়িকা হল শিলিগুড়ির মনামি। ঋষির সঙ্গে দেবদাসীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে যে সিরিজ, তাতে মনামির আপত্তি ডিপ ব্লোজব, ওরাল ক্রিমপাই সিকোয়েন্স। মারিজুয়ানা ছাড়া ওইসব শট দেওয়া মুশকিল। যা-ই হোক, ডুয়ার্সের শুটিং স্পট থেকে শুরু করে প্রোডাকশন প্ল্যান ফাইনাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঋষিকাম প্রজেক্ট কি সাকসেস হবে?

২৮

দাসবাবুর বেশ গরম লাগছে। শীতের প্রকোপ একটু কমলেও জলপাইগুড়ি শহরের হোটেলে বসে এসি চালাবার প্রয়োজন এখনও নেই। কিন্তু দাসবাবু এসি চালিয়েছেন। আজ বিকেলে দার্জিলিং মেল ধরে তাঁর কলকাতা চলে যাওয়ার কথা। তার আগে জলপাইগুড়িতে নতুন ব্যবসা নিয়ে একটা মিটিং ছিল। এই শহরে একটা ফ্ল্যাট শুটিং-এর জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে কিছুদিন হল। দ্রুত বেশ কিছু শুটিং করে ফেলা দরকার। নবীন রাইয়ের ফ্ল্যাটে দিনে একটার বেশি ভিডিয়ো তোলা মুশকিল। অথচ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে অন্তত দশটা ভিডিয়ো দরকার। পার্টির জরুরি অর্ডার এসেছে। আগামীতেও এইরকম অর্ডার আসবে ধরে নিয়েই বিকল্প একটা শুটিং প্লেস দরকার হচ্ছিল। কিন্তু নবীন রাই শিলিগুড়িতে বিকল্পটা চাইছিলেন না। জলপাইগুড়িই ছিল তাঁর পছন্দ। যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে, তার মালিক শিলিগুড়িতেই থাকেন। কেউ কেউ বলে যে, এনজেপি'তে তেল চুরি চক্রের একটা অংশ তাঁর কথাতেই কাজ করে। অবসরে মেয়ে নিয়ে জলপাইগুড়িতে দু'-এক রাত্তির কাটানোর জন্য জলপাইগুড়ির ফ্ল্যাটটা কিনেছেন। নবীন রাইয়ের সঙ্গে তাঁর খাতির আছে মেয়ে জোগাড় করার সূত্রে।

আজ দাসবাবুর সঙ্গে এইসব নিয়ে মিটিং-এ বসার কথা ছিল দুপুর বারোটায়। দাসবাবু গতকাল বিকেলে জলপাইগুড়ি এসেছেন। আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক হালকা মেজাজেই ছিলেন। নবীন রাই একটা প্রিন্ট আউট দিয়েছিল গতকাল। সে কাগজে পর্নো ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক কিছু দরকারি তথ্য ছিল। বিশ্বে এই মুহূর্তে ফি-বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে তেরো বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়। প্রতি সেকেন্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ তিন হাজার ডলারের বেশি। মার্কিন আর ইউরোপ মুল্লুকে বেশি চাহিদা 'গে' আর 'লেসবি' ক্যাটেগরির ভিডিয়ো। ভারতের দর্শকদের পয়লা পছন্দ হল পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহিত মহিলার সংগম। নমুনাস্বরূপ যেসব ভিডিয়ো বানানো হয়েছিল, তার মধ্যে মনামি নামের শিলিগুড়ির মেয়েটার কাজ সুপারহিট। তাকে দিয়ে 'ঋষিকাম' নামের একটা সিরিজ তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে একটা মালয়ালম ওয়েবসাইট। এক ঋষির সঙ্গে দেবদাসীর যৌন সম্পর্কের কাহিনি। সেটা অবশ্য ফ্ল্যাটে শুট করা সম্ভব নয়। নবীন রাই লোকেশন খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এ নিয়েও মিটিং-এ আলোচনা হবে ঠিক ছিল।

কিন্তু একটা ফোন এল সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। দিল্লি থেকে কথা বলতে চাইছে— এটা শোনামাত্র দাসবাবু সোজা হয়ে বসেছিলেন সোফায়। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানানোর থাকলেই সেখান থেকে বিনা নোটিশে ফোন আসে। ফোনের ওপার থেকে একটা শীতল কণ্ঠস্বর দাসবাবুর বুকে কাঁপন জাগিয়ে জানিয়ে দিল একটা তথ্য। চঞ্চল থাপা আর সুখান লাকড়ার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে সোনাপুর নামক একটা জায়গার কাছে। তারা একজন সুপারি কিলারকে নিয়ে বেরিয়েছিল। সে লোকটাই দু'জনকে খতম করে গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এই জাতীয় সংবাদ সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল দাসবাবুর কাছে। এমনটা হওয়ার কথা নয়। চঞ্চল আর সুখান অনেক দিনের লোক। কিন্তু তাদের থেকে সুপারি নিয়ে তাদেরকেই খুন করে পালিয়ে যাওয়ার কাজটা কে

করেছে? কেন করেছে? এ লাইনে এমনটা অসম্ভব! সোনাপুরের কাছে থাকা একজনকে ‘পুরা অফ’ করে দেওয়ার দায়িত্ব দাসবাবুই দিয়েছিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জির ঘরে বসে। এই ঘটনার পর ধরেই নেওয়া যায় যে ‘পুরা অফ’ করে দেওয়ার কাজটা হয়নি। টার্গেট বেঁচে আছে। সে বেঁচে থাকা মানে কাশিয়াগুড়ির কেসটার এমন একটা সূত্র বেঁচে থাকা, যার কোনও রেকর্ড পুলিশের হাতে আছে। ধূপগুড়ির সেই এক্স-পুলিশটাও জেনে গিয়েছে সেই তথ্য!

ফলে, দাসবাবুর গরম লাগতে শুরু করেছিল। তিনি নবীন রাইকে ফোন করে মিটিংটা বাতিল করালেন। তারপর থেকে শীতের ডুয়ার্সে বসে তিনি এসি চালিয়ে রেখেছেন। দু’জন খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় দাসবাবুকে কোনও কৈফিয়ত দিতে হবে না দিল্লিকে। কিন্তু ঘটনাটা যে একটা অশুভ ইঙ্গিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটা কি ‘ডার্ক ক্যালকাটা’র কাজ?

ডুয়ার্সে ডার্ক ক্যালকাটার পা পড়তে চলেছে— এমন একটা খবর দাসবাবুর কাছে ছিল। কোনও এক প্রাক্তন কেএলও জঙ্গির হাত ধরে ডুয়ার্সে ঢুকছে তারা। সম্ভবত সেই জঙ্গির তত্ত্বাবধানে লাল চন্দন পাচারের একটা র‍্যাকেট ডুয়ার্সে অনেকদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। খুন দুটো কি ডার্ক ক্যালকাটারই ষড়যন্ত্র? সুপারি কিলার হিসাবে কাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেটা এই মুহূর্তে জানা দরকার!

দাসবাবু এবার সক্রিয় হলেন। বেলা একটা নাগাদ তিনি হোটেলের বিল চুকিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা করলেন আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে। বিজু প্রসাদ সেখানেই আছে। অবিলম্বে দলের লোকজনদের সতর্ক করতে হবে। দু’-একদিনের মধ্যে সোনাপুরের ছেলেটাকে ‘পুরা অফ’ করে দেওয়া জরুরি। ছেলেটা ধরা পড়ে গেলে ডুয়ার্সে দলের গোটা ছকটাই বানচাল করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে নেই। তেমনটা হলে বুদ্ধ ব্যানার্জি কী করবেন তা ভাবতেই গরম লাগছিল দাসবাবুর। তবে তিনি পোড় খাওয়া লোক। আস্তে আস্তে ভিতরের চাপটাকে হালকা করে আনলেন আলিপুরদুয়ার যেতে যেতে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। সব কিছুর একটা পজিটিভ দিক আছে।

বিকেল পাঁচটার একটু আগে আলিপুরদুয়ার শহরে ঢুকল গাড়িটা। দিনের আলো শেষের দিকে। শহরে বেশ শীত। কোর্ট মোড়ের সামনে দাসবাবু গাড়ি দাঁড় করালেন। টাকা মিটিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে এগতে লাগলেন সোজা। তারপর একটা গলিরাস্তা ধরে মিনিটকয়েক হেঁটে থামলেন একটা বাড়ির সামনে। ছোট দোতলা বাড়ি। একতলার দরজার উপরে একটা ছোট সাইনবোর্ডে লেখা ‘কালজানি ট্রাভেল এজেন্সি’। একতলাটা বিজু প্রসাদ ভাড়া নিয়েছে সম্প্রতি। সাইনবোর্ডটা তাঁরই লাগানো। আলিপুরদুয়ারে একটা ডেরা থাকার প্রয়োজনীয়তা দাসবাবুকে জানিয়েছিল বিজু প্রসাদ। তিনি অনুমতি দেওয়ার পর এই বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়েছে সে। এই মুহূর্তে সে এখানেই আছে।

দাসবাবু কলিং বেল টিপলেন।

২৯

শিলিগুড়ি নগরীর উপকণ্ঠে একটা বার কাম রেস্তরাঁয় বসে মনামি ‘ঋষিকাম’ নিয়ে ভাবছিল। তার হাতে কয়েকটা কাগজ। ঋষিকাম-এর ওয়ানলাইনার আর সিকোয়েন্সের ডিটেইল ছাপা কয়েক পাতার প্রিন্ট আউট। এই প্রজেক্টটা নিয়ে মনামি বেশ উত্তেজিত। এই কাজটা দেখার পর একটা মার্কিন পর্নো সাইট তার সঙ্গে চুক্তি করবে বলে নবীন রাই আশাবাদী। সেটা বেশ নামী সাইট। সানি লিওন কাজ করেছেন সেই সাইটের হয়ে। এ ছাড়াও বিশ্বের প্রথম দশজন পর্নো অ্যাক্ট্রেসের সকলেই এদের প্রাক্তন নায়িকা। পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন নায়িকা তুলে আনার ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটাটার প্রচুর অবদান।

> মনামির প্রশ্নের উত্তরে লোকটা কফির কাপে একটা চুমুক দিল। তারপর খাম দুটোর উপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘ডার্ক ক্যালকাটা কথাটা মনে রাখবেন। নবীন রাইয়ের ফোন আর ধরার দরকার নেই এখন থেকে। উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট পর্নো ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইউ উইল বি আওয়ার অ্যাসেট।’

‘ঋষিকাম’-এর জন্য নবীন রাই একটা বাগানবাড়ি ঠিক করেছে লোকেশন হিসেবে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাস্তার মাঝামাঝি একটা জায়গা। প্রায় দুই বিঘে জমি জুড়ে নানান গাছপালা। উঁচু প্রাচীর। জাতীয় সড়ক থেকে বেশ খানিকটা ভিতরে। একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আসবেন চেন্নাই থেকে। বাগানবাড়ির একটা ঘরের ভিতরটা তিনি এমনভাবে সাজাবেন যে, দেখে মনে হবে কোনও কুটিরের অভ্যন্তর। ক্যামেরা আর লাইটের লোকও বাইরের। সব মিলিয়ে বেশ এক্সপেন্সিভ প্রজেক্ট। ছবিটা প্রায় দেড় ঘণ্টার। শুটিং হবে ন’টা থেকে চারটে। কারণ মনামিকে শিলিগুড়ি ফিরতে হবে। নবীন রাইয়ের ধারণা, তিন দিন শুট করলেই কাজটা নেমে যাবে। ঋষির ভূমিকায় একজন কেরলিয়ান যুবকের অভিনয় করার কথা।

এইসব নিয়েই আলোচনার জন্য এই বার কাম রেস্তরাঁতে আসা। নবীন রাইয়ের সঙ্গে কথা শুরুও হয়েছিল। স্ক্রিপ্টে মোট পাঁচটা সেক্স সিকোয়েন্স। মনামির দু’-একটা আপত্তি ছিল। বিশেষ করে ওরাল সেক্স নিয়ে। ‘ডিপ থ্রোজব’-এ তার আপত্তি নেই, কিন্তু ‘ওরাল ক্রিমপাই’ দিয়ে তিনটে সিকোয়েন্স শেষ হচ্ছে— এটা মানা যাচ্ছে না। তার মতে শেষ সিকোয়েন্সে ব্যাপারটা থাকতে পারে। তার পক্ষে মারিজুয়ানা ছাড়া এই ধরনের সিকোয়েন্স করা অসম্ভব। কিন্তু সেটা সে ঘন ঘন নিতে রাজি নয়।

মিনিটকয়েক আলোচনার পর নবীন রাই একটা ফোন পায়। ফোনটা ধরার পর তার মুখের রেখায় পরিবর্তন লক্ষ করেছিল মনামি। তারপর নবীন রাই ‘এক্সকিউজ মি’ বলে টেবিল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে ফোনে কথা বলার জন্য। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল সে বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলে যাচ্ছে। মনামি এবার বোর হতে শুরু করেছে। সে এক পাত্র স্কচ নিয়েছিল। সেটা প্রায় শেষ।

আরও মিনিট পনেরো কাটিয়ে নবীন রাই ফিরে এল। তাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তখন। মনামি জিজ্ঞেস করল, ‘এনি প্রবলেম?’

‘নট সিরিয়াস।’ নবীন রাই সহজ হতে চেষ্টা করল যেন, ‘বাট সরি ফর এন্ডিং আওয়ার মিটিং। আই উইল রিং ইউ ইভনিং।’

‘ওকে।’ মনামি গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

মিনিট চল্লিশ পর মনামি অটো থেকে নামল নিজেদের ফ্ল্যাটের কাছাকাছি একটা মোড়ে। শিলিগুড়ি বড্ড ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে। শীতকাল হলেও অটোয় আসতে আসতে মনামির শরীরে ঘাম জমছিল। নামার পর উজ্জ্বল হলুদ সোয়েটারের বোতামগুলো খোলার জন্য রাস্তার এক কোনায় দাঁড়াল সে। অটো থেকে তাকে নামতে দেখে উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে একটা লোক দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছিল মনামির কাছাকাছি। সোয়েটারটা খুলে হাতে নিয়ে মনামি যখন রুমাল বার করে মুখ মুছছে, তখন লোকটা তার সামনে এসে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, ‘আপনিই মনামি ম্যাডাম, তা-ই তো?’

মনামি লোকটার দিকে তাকাল। সাধারণ চেহারার একটা ছেলে। একে আগে কখনও দেখেনি মনামি।

‘একটু কথা ছিল। সামনে একটা কফি

শপ আছে। সেখানে বসা যায়।'

'আপনি কে?' মনামি ঝাঁজালো স্বরে জানতে চাইল। কিন্তু লোকটার আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখল না সে। আগের মতোই বিনয়ের সুরে বলল, 'সেটাই বলতে চাইছি ম্যাডাম। কফি শপটা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে। কথাটা খুব জরুরি।'

'অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কফিশপে যাই না।'

কথাটা বলেই হাঁটা শুরু করেছিল মনামি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল। কারণ লোকটা আগের মতোই বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'নবীন রাইয়ের চাইতে আমরা অনেক বেশি পে করি ম্যাডাম।'

কয়েক সেকেন্ড লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনামির মনে হল কফি শপে যাওয়া উচিত। দরকার হলে সেখান থেকে নবীন রাইকে এসএমএস করে দেবে টুক করে।

কিন্তু এসএমএস-এর কোনও দরকার হল না। কফির অর্ডার দেওয়ার পর লোকটি পকেট থেকে দুটো মোটা খাম বার করে টেবিলে রেখে বলল, 'মোট এক লাখ আছে এতে। আপনি ভার্বালি রাজি হলেই খাম দুটো আপনার। বাকি কথা সময়মতো হবে।'

'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

'সিম্পল ম্যাডাম।' লোকটা হাসল। 'নবীন রাইয়ের ঋষিকাম প্রজেক্টটার ডিটেইল আমরা পেয়ে গিয়েছি। ওই ভিডিয়োটা আমরাই করব। আপনিও থাকবেন। আপনি রাজি হলে উইদিন ফিফটিন ডেজ প্রজেক্টটা নামিয়ে ফেলব আমরা।'

'আমরা বলতে?'

মনামির প্রশ্নের উত্তরে লোকটা কফির কাপে একটা চুমুক দিল। তারপর খাম দুটোর উপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ডার্ক ক্যালকাটা কথাটা মনে রাখবেন। নবীন রাইয়ের ফোন আর ধরার দরকার নেই এখন থেকে। উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট পর্নো ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইউ উইল বি আওয়ার অ্যাসেট।'

খাম দুটো তুলে নিয়ে মনামি হালকা হেসে বলল, 'এগ্রি।'

৩০

দীননাথ চৌহান যে নিজের এলাকাটা হাতের তালুর মতো চেনে, সেটা টুরিস্ট লোকটাকে বোঝাতে গিয়ে সে দিন বলেছিল, 'বিলকুল স্যার। আমি হ্যান্ড অফ পাম চিনি স্যার। এখানকার পঞ্চায়েতকে বলতে গেলে স্যার আমরাই তো রিক্রুট করলাম। খুব টাফ ফাইট ছিল স্যার। তবুও ধরেন, ২২ ভোটে তো উইনিং হল আর উনি রিক্রুট হলেন। নেক্সট টাইমে...।'

'আপনার হাতে কি টাইম হবে?' দীননাথের বাক্যস্রোতকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চেয়েছিল টুরিস্ট, 'টাইম ইজ মানি। আপনার হাতে টাইম থাকলে কিছু মানি হয়ে যেত।'

'মানে?' দীননাথের চোখ সরু হয়ে যায়। 'আপনি কি কোনও কাজের কথা মিন করছেন স্যার?'

'কাজই তো।' টুরিস্ট এবার পাথরটার উপর বসল, 'দরকারে পঞ্চায়েতের ফান্ডেও মানি দেব।'

'কিন্তু কোনও ইনলফুল জব আমাকে বলবেন না। আমি মৈথিলি ব্রাহ্মণ। আনলিগাল ওয়ার্ক নট মাই ফ্যামিলি স্ট্যাটাস!'

গম্ভীর গলায় বলেছিল দীননাথ চৌহান। টুরিস্ট তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দীননাথ কথা শেষ করতেই সে নরম স্বরে বলেছে, 'একটা লোক এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ফোটো দেব আপনাকে। আর একটা নাম্বার। আপনি শুধু ফোনে জানিয়ে দেবেন লোকটা কোথায় কোথায় যাচ্ছে। সিম্পল জব। নো ইললিগাল ম্যাটার ইনক্লুডেড। পেমেন্ট সেন্ট পার্সেন্ট অ্যাডভান্স।'

তখন দীননাথের গলার স্বরেও নমনীয়তা এসেছিল। প্রায় নিঃশব্দের সুরে সে চল্লিশ ডিগ্রি সামনে ঝুঁকে বলল, 'অ্যামাউন্টটা এপ্রোমেক্স কত দিবেন?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে দুটো হাজার টাকার নোট আর দুটো পাসপোর্ট সাইজের ফোটো দীননাথের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই টুরিস্ট। একটা লোক আর একটা মেয়ের ফোটো। লোকটাকে দীননাথ আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু মেয়ের মুখটা তার চেনা চেনা ঠেকেছিল। সে কথা জানাতেই টুরিস্ট তার কাঁধে হাত রেখে বলেছে, 'এখনই কিছু বলার দরকার নেই ইয়াং ম্যান। নিশ্চিত হয়ে তারপর জানাবে। আমার মোবাইল নাম্বার রেখে দাও।'

এর পর কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। মানিব্যাগের মধ্যে ছবি দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন দীননাথের সঙ্গে। রিসর্টের হরেক দায়িত্ব সামলে তার হাতে সময় বেশি থাকছে না এখন। কিন্তু মেয়েটাকে যে সে কোথাও দেখেছিল, সে ব্যাপারে নিশ্চিত দীননাথ। কিন্তু কোথায়?

নতুন বছর পড়ে গিয়েছে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ এখন। টুরিস্টদের আসা কমেছে খানিকটা। লোকনাথ রিসর্ট থেকে ২ কিলোমিটার দূরে স্থানীয় বাজারের কাছে বাইক দাঁড় করিয়ে দীননাথ তাদের পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে রোদ্দুর মাখতে মাখতে আলোচনা করছিল দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। কথা বলতে বলতে দীননাথের মনে হল, ছবি দুটো পঞ্চায়েত সদস্যকে দেখানো যায়। টুরিস্ট স্যার অবশ্য বলে গিয়েছেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে। দীননাথ তো খুলে কিছু বলবে না। শুধু ছবি দুটো দেখাবে।

পঞ্চায়েত সদস্য দীপেনের বয়স বেশি নয়। ফোটো দুটো হাতে নিয়ে দীননাথকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটাকে চিনলে না দিনুদা?'

'চিনিস নাকি?' দীননাথ উদ্গ্রীব হয়, 'আমিও ভাবলাম যে কোথাও দেখেছি। বাট মাইন্ডে আসছে না।'

'কন্যাসাথি এনজিও-র ম্যাডাম। এর নাম লাবনি দাস।'

'হাঁ হাঁ!' মনে পড়ে গেল দীননাথের, 'ফিমেলদের নিয়ে সার্ভে করতে আসেন।'

'লোকটাকে তো দেখিনি আগে।' দীপেন ছবি দুটো ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'কিন্তু ছবি কোথায় পেলে?'

'আরে, সে দিন ফাইন্ড করলাম কী, রাস্তায় একটা এনভেলাপ পড়ে আছে। তা ওপেন করলাম। দেখি দুটো ফোটো।'

'তাহলে ওদের চেনাই কেউ হবে। লাবনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। ওদের এনজিও-র গাড়িটা তো এদিকে মাঝে মাঝেই আসে।'

এর পর পঞ্চায়েত সদস্য আবার ফিরে যেতে চেয়েছিল রাজনীতির আলোচনায়। কিন্তু দীননাথ চৌহানের মন তখন সেখানে ছিল না। দু'-চার মিনিট কথা বলেই সে বাইক নিয়ে ছুটেছিল ফরেস্টের রাস্তায়। স্থানীয় লোক বলে, ফরেস্টের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু শর্টকাট সে ব্যবহার করতে পারে। তেমনই একটা পথের ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে সে পকেট থেকে মোবাইল বার করে। লাবনি দাসের কথা সে দিন যদি টুরিস্টকে মনে করে বলে দিতে পারত, তবে কাজটা হত বলার মতো। কিন্তু 'মেমারি শর্ট' হয়ে যাওয়ায় পারেনি।

'হ্যাঁ দীননাথ, খবর পেলে কিছু?'

কয়েকটা রিং-এর পর ওপাশে টুরিস্ট স্যারের গলা শুনল দীননাথ। উত্তেজনায় ঝড়ের বেগে সে জানাল, 'ফিমেল ইজ সার্চিং। ফাউন্ড স্যার। লাবনি দাস। কাম উইদ এনজিও। কন্যাসাথি স্যার। আমি জাস্ট জানলাম স্যার।'

'ইউ আর গ্রেট দীননাথ। এর মধ্যেই আমাদের দেখা হবে। লোকটার খোঁজ পেলেই জানাবে। বাকি কথা দেখা হলে।'

আপ্লুত দীননাথের চোখে জল এসে যায়। সে যে 'গ্রেট'— এটা সে জানে। কিন্তু এই প্রথম কেউ স্বীকার করল সেটা।

(ক্রমশ)

বছরভর বারবার যাওয়া যায় কালীপুর ইকো ভিলেজ

ঘন সবুজ অরণ্য আর চা-বাগিচা ডুয়ার্সের নিজস্ব সৌন্দর্য। সেই অরণ্যে যদি বন্য প্রাণীদের সাক্ষাৎ মেলে, তবে তো সেটা বাড়তি পাওনা বটেই। ডুয়ার্সের বনবাংলোগুলি সেভাবেই তৈরি, যাতে পর্যটক জঙ্গলের সকাল-সন্ধে ঐকান্তিকভাবেই অনুভব করতে পারে। কালীপুর ইকো ভিলেজ সেরকমই এক বনবাংলো, যেখানে মাত্র ২৪ ঘণ্টা থাকার সুযোগেই সঞ্চিত হয়েছিল রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতা।

লাটাগুড়ি ফরেস্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগেই নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার কাম বুকিং সেন্টার। গোরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন থেকে কালীপুর ইকো ভিলেজে থাকার জন্য ফরেস্ট রিসর্ট বুক করা হল। সেখান থেকে কিলোমিটার দশেক গাড়ি করে গিয়ে লাটাগুড়ি বা গোরুমারা ফরেস্টেরই এক্সটেনশন। আর তারই পিছন দিকটায় ওই কালীপুর ইকো ভিলেজ। ঢুকেই বেশ বড়সড় একটা মাঠ। সেখানেই গাড়ি রাখার ব্যবস্থা।

মাঠের এক প্রান্তে অফিসঘর, কাগজপত্রে সইসাবুদ সারা হল। আমরা সব মিলিয়ে ছ'জন— আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন, আমাদের দুই ছেলেমেয়ে আর আমার ভাই ও ভাইয়ের নব্যবিবাহিত স্ত্রী। সর্বসাকুল্যে তিনটি মাত্র ঘর। তার মধ্যে দু'টিতে আমরা। অন্যটিতে আর-এক অল্পবয়সি স্বামী-স্ত্রী।

উঁচু কাঠের স্তম্ভের উপর দোতলা সমান উচ্চতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি করে ঘর, সংলগ্ন বাথরুম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে রিসর্ট দু'টি সংযুক্ত হয়েছে ডাইনিং ঘরটির সঙ্গে। ওই ঘরটির ঠিক নিচে একতলাতেই কিচেন। কফির অর্ডার দিয়ে বিছানায় একটু রিল্যাক্স মুড নিতেই লাঞ্চের জন্য ডাক পড়ে গেল। কোনওমতে কফি শেষ করে ডাইনিং টেবিলে চলে গেলাম। লাঞ্চের একটু তাড়া আছে, একটু পরেই মোষের গাড়ি চলে আসবে আমাদের নিতে। সাড়ে তিনটেয় খেতে বসলাম। অত্যন্ত সাধারণ খাওয়া, কিন্তু স্বাদ চমৎকার। আসলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ফরেস্ট রিসর্টগুলো এতটাই নিখুঁত হয় যে, সব কিছুতেই একটা আলাদা তৃপ্তি অনুভূত হয়।

সাড়ে তিনটের সময় মাঠে তিনটি মোষে টানা গাড়ি এসে হাজির। চড়লাম তাতে। সেও এক মজার অভিজ্ঞতা। দুলতে দুলতে গাড়িতে চড়ে এগচ্ছি ১ কিলোমিটার দূরের মেধলা ওয়াচটাওয়ারের দিকে। গাড়ি থেকে নেমেও বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে পৌঁছালাম ওয়াচটাওয়ারে। বিকেল তখন পড়ে এসেছে। সূর্যের আলোর তেজ নেই, কিন্তু হালকা রোদ্দুরে নদীর বালি চিকচিক করছিল। চারদিকের ঘন নৈঃশব্দ্য চিরে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক। আশপাশে চোখ যেতেই দেখি অন্তত গোটা পাঁচেক ময়ূর আর সেই সঙ্গে তিন-চারটে ময়ূরী। মন ভরে গেল। পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, ওই যে গন্ডার। তাকিয়ে দেখলাম অল্প দূরত্বে গাছের আড়ালে স্থির কোনও মূর্তি যেন।

সামান্যই অপেক্ষা করতে হয়েছিল, হঠাৎ দেখলাম মূর্তি নদীর ও প্রান্তের জঙ্গল থেকে আর-একটা মা-গন্ডার তার সন্তানকে নিয়ে নদী পেরচ্ছে নিশ্চিন্তে। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তো তাকিয়েই রইলাম। এপারে পৌঁছানোর পরও বেশ খানিকক্ষণ দেখা গেল ওদের। তারপর মিলিয়ে গেল নিজেদের গন্তব্যে। চোখ ফেরাতেই দেখি খেঁকশেয়ালের মতো এক জন্তু, কিন্তু গায়ের রং খানিকটা রেড পান্ডার মতো। এদিক-ওদিক দেখে লাফিয়ে চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে। পরে জলপাইগুড়ি ফিরে এসে জেনেছিলাম ওটা ঢোল। এক ধরনের কুকুর, যা গোরুমারা রেঞ্জ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। মেধলা যদিও গোরুমারা রেঞ্জেই, তবু সরকারিভাবে বন দপ্তরের কাছে ঢোল-এর অস্তিত্বের কথা নথিভুক্ত ছিল না। মেধলা ওয়াচটাওয়ার থেকে তোলা ওই ঢোল-এর ছবিটি ভাবিয়ে তুলেছিল বন দপ্তরকে— তাহলে ওখানেও ঢোল আছে!

রিসর্টে ফিরতে প্রায় সন্ধে। সময়টা ছিল নভেম্বরের শেষ। গরম কফি সহযোগে একটা জম্পেশ আড্ডাও জমে উঠল আমাদের ঘরে। খাবার পরিবেশন করে যে ছেলেটি, সে এসে জানিয়ে গেল, বাচ্চাদের নিচে নামতে দেবেন না আর, এখানে যখন-তখন চিতা বাঘ চলে আসে। রিসর্টের নিচের ওই জায়গাটায় শুয়ে থাকে মাঝেমধ্যেই। তা ছাড়া ওইপাশটা গোখরো সাপে ভরতি। আমরা সবাই বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আড্ডার বিষয় মোড় নিল। আটটা

নাগাদ আমাদের ডাক পড়ল 'আদিবাসী নাচনী আঁখড়া'য়। ওটা বড় মাঠটির অন্য প্রান্তে পাকাপোক্ত এবং স্থায়ীভাবে বানানো। সেখানে বসার জায়গায় বসলাম আমরা তিনটি রিসর্টের মোট আটজন। জনা পনেরোর একটা আঞ্চলিক জনবসতির দল, সাদ্রিতে তাদের রচিত গান এবং তাতে নিজেদের বসানো সুর নিয়ে হাজির মঞ্চে। মাদলের ছন্দ, তার সঙ্গে কোমর জড়িয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে ওদের নাচ দেখছিলাম বিভোর হয়ে। শুধু দেখছিলাম না, ভাবছিলাম যদি মাদলের তালে তালে পা মেলানো যেত...

মাত্র একবারই ডেকেছিল। ব্যাস, দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে, কোমর জড়িয়ে নেমে পড়লাম নৃত্যের তালে তালে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বেশ কঠিন হয়ে উঠছিল ওদের তালে তাল মেলাতে। মনে মনে শুধু এটাই ভাবছিলাম, নিষ্ঠা কিংবা আন্তরিকতা নয়, কত পরিশ্রম আর অভ্যেস থাকলে তবেই এমন নিখুঁত একটি পরিবেশনা হতে পারে। ছন্দের মূর্ছনায় বুঁদ হয়ে কোমর জড়িয়ে নাচতে নাচতে বেশ ক্লান্তি নিয়েই ফিরে এলাম রিসর্টে।

ডিনার শেষ করে তাড়াতাড়ি বিছানায় যাবার পালা। কারণ, পরদিন অপেক্ষা করে আছে একটি নতুন উত্তেজনাপূর্ণ ভোর। হাতির পিঠে বেড়ানো। সকাল ছ'টার মধ্যে তৈরি থাকতে হবে। আধো ঘুমে তন্দ্রাচ্ছন্নতায় কেটে গেল রাত। ভোর হতেই সব্বাই রেডি। মাঠের এক কোণে রাইডিং পোস্ট। পৌঁছালাম যথাসময়ে। ফুলমতি আর কিরণরাজ দু'টি হাতির নাম, তারাও যথাসময়ে হাজির। আমাদের ছোট দুই ছেলেমেয়েসহ সকলেই দারুণ উত্তেজিত। মাহুতের পিছনেই বসতে হল আমাদের। তিনজন করে একটি হাতিতে। ঠিকঠাক শক্ত করে ধরে বসতেই চলতে শুরু করল তারা। প্রথম দুলুনিতে তো মনেই হচ্ছিল, এই বুঝি পড়েই যাব। না, পড়িনি কেউই। হাতি হেঁটে চলেছে দুলকি চালে। খানিকটা যেতেই বসার কায়দাটা আয়ত্ত করে নিলাম, যাতে পড়ে না যাই। ক্রমে আমরা পৌঁছে গেলাম মূর্তি নদীর বেড়ে। নদী পেরিয়ে আমাদের ফুলমতি চলতে লাগল ও প্রান্তের জঙ্গলে। পাশে পাশে হেঁটে চলেছে কিরণরাজ। বড় গাছের জঙ্গল নয়, ঘাসের জঙ্গল। কিন্তু ঘাসগুলোর উচ্চতাই প্রায় হাতির পিঠ ছুঁইছুঁই। নদীটা পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে পৌঁছাতেই মাহুত দাঁড়াতে বলল ফুলমতিকে।

চোখগুলো আমাদের বিস্ফারিত। অন্তত ২০-২৫ ফুট দূরত্বের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে তিনটি গন্ডার। ঘাস খাচ্ছিল নির্বিকার। আমাদের দেখেই খাওয়া বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল তিনটিতেই। নির্বাক বোঝাপড়া চলল অল্প কিছুক্ষণ। তারপর আবার ওরা

ঘাস খেতে লাগল, আর ফুলমতি ও কিরণরাজ আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল আরও গভীরে। প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠছিল রোমাঞ্চময়। উত্তেজনার অবিশ্রান্ত প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল প্রবল বেগে। খানিকটা যেতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ফুলমতি। মাহুত বলল, ডান দিকে তাকান। তাকিয়ে দেখি বিশাল শিংওয়ালা এক অতিকায় গৌর (যাকে আমরা বাইসন বলি) শিং বাগিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সুযোগ পেলেই তেড়ে আসবে। মাহুত সঞ্জয় বলল, 'এখানে দাঁড়ানো যাবে না বেশিক্ষণ, ও ব্যাটা খেপে আছে। কাল রাতে ওকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর মেজাজ ঠিক নেই।' বলেই ঘুরিয়ে নিল ফুলমতির মুখ। ফুলমতিও বাধ্য মেয়ে। অন্য পথে এগতে লাগল।

ঝোপঝাড় ঠেলে ঠেলে এগতে লাগল ওর প্রতিদিনকার পরিচিত নির্দিষ্ট পথে। এখানকার ঘাসপাতাগুলো বড় ধারালো হয়। সিলিকন ডিপোজিটের জন্য পাতার ধারগুলো এমন হয় যে, হাত লাগলে চিরে যায় হাতের চামড়া। সেগুলোই এসে আছড়ে পড়ছে গায়ের উপর। হাত দিয়ে সরাতে সরাতেই এগিয়ে চলেছি। এমন ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি যে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। কেবল বেশ খানিকটা দূরে দেখতে পাচ্ছি কিরণরাজকে, যার পিঠে আমাদের পরিবারের বাকিরা। ধীরে ধীরে নদীর বেড়ে পৌঁছে গেলাম আবার। বুঝলাম আমাদের যাত্রা এবার শেষের দিকে। চোখে পড়ছে মেধলা ওয়াচটাওয়ার। ফরেস্ট পেরিয়ে বাঁ পাশে চা-বাগান রেখে আমরা ফিরতে লাগলাম রিসর্টের দিকে। অবশেষে রাইডিং পোস্টে এসে গা লাগিয়ে দিল ফুলমতি। আমরা নেমে পড়লাম। নিচে এসে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলাম ফুলমতি আর কিরণরাজের শুঁড়ে, গায়ে, পায়ে। বাধ্য ছেলেমেয়ে দুটো ধীর, নম্র পায়ে বেরিয়ে গেল রিসর্ট থেকে ওদের থাকার নির্দিষ্ট জায়গার দিকে। মাথার মধ্যে শুধু ভ্রাম্যমাণ কতকগুলো বন্য প্রাণের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। তল্পিতল্পা গোছানোর উদ্দেশ্যে যে যার ঘরে চলে গেলাম আমরা।

গাড়িতে সমস্ত মালপত্র লোড হওয়া শেষ হলে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হল দু'টি উপহার। ওখানকার লোকাল সেল্‌ফ-হেল্প গ্রুপের মহিলাদের হাতে তৈরি পাটের একটি পাপোশ আর একটি হাতব্যাগ। দু'টির উপরেই সেলাই করে লেখা আছে— GORUMARA NATIONAL PARK। একরাশ সুখস্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরে এলাম জলপাইগুড়িতে।

শ্বেতা সরখেল

ছবি: অতনু সরখেল

হাথি কো শুঁড় কিউঁ নহি হ্যায়

অ্যাঁ, সঙ্গে ফরেস্ট গার্ড কেন?!!

প্রিসাইডিং অফিসারের চোখ-মুখ কুঁচকে গেল। ডিসিআরসি ভোটিং মেটিরিয়াল কাউন্টার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ঘামতে ঘামতে তিনি প্রশ্ন করলেন। কোনও সদুত্তর পেলেন না। তার উপর ঘাড়ের উপর মাইক্রো অবজার্ভার, একগুচ্ছ কেন্দ্রীয় সেনা, ভিডিয়ো ক্যামেরা। যখন দেখলেন ইলেকশন ডিউটি পড়েছে এক হদ্য বনবস্তি প্রাইমারি স্কুলে, প্রথমে টেনশন হয়েছিল, তারপর আঙুর ফল টকের ঘরানায় নিজেকে প্রবোধ দিলেন, বন এলাকার মানুষজন সহজ-সরল হবে, ঝামেলা কম হবে, ফাঁকফোকরে বনের টাটকা বাতাস খেয়ে নেওয়া যাবে! ডুয়ার্সে থেকেও বন্য ডুয়ার্সে কম যাওয়া হয় যে!

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

যা-ই হোক, সব ঝক্কি শেষে ডিসিআরসি থেকে বার হওয়া গেল। ম্যাজিক গাড়ির জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকতেই শরীর জুড়িয়ে এল। জাতীয় সড়ক আজ ফাঁকা ফাঁকা। ভোটের আলস্যে তিস্তা নদীটাও দুপুরে কেমন ছুটি-ছুটি ভাবে পড়ে রয়েছে। প্রিসাইডিংবাবু ভাবলেন, সেই কবে কোন ছোটবেলায় গ্রামের নদী নিয়ে একটি পদ্য স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছিলেন। সে কোন কালের কথা। ডুয়ার্সে সকলের বুকেই এমন পদ্য ঘোরাফেরা করে। করবেই না বা কেন! চোখ পাতলেই রূপ আর রূপ!

ফরেস্ট অফিসের গাড়ি সঙ্গ নিয়েছে। পাকা রাস্তা ছেড়ে কখন ম্যাজিক গাড়ি ঢুকে পড়েছে বনের পথে। শাল-সেগুনের দীর্ঘ ছায়া, একটানা ঝিঁঝির ডাক, অন্য পোলিং অফিসারদের আকস্মিক উচ্ছ্বাস, 'বাঁদর বাঁদর', 'ওই যে ময়ূর' ইত্যাদি। বনের বাইরেটা যত ঘন মনে হয়, ভিতরটা তত নয়। কত গাছ কাটা হয়ে গিয়েছে। ডালপালাগুলোরও তো শান্তি নেই। জ্বালানির জন্য নির্বিচারে কেটে নিয়ে যায় আশপাশের মানুষজন। নজরেও পড়ল, মাথায় ডালপালার বোঝা নিয়ে অনেকেই বাড়িমুখো! অন্য দিন তো এর চেয়েও বেশি হয় নিশ্চয়?

পৌঁছানো গেল বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেশ শান্তি ছড়ানো চারদিকে। দূর থেকে একটা লম্বা ডাক। কী ডাকছে? বনকর্মী এগিয়ে এলেন, 'ময়ূরের ডাক আগে শোনেননি বুঝি?'

স্কুলঘরের দিকে তাকিয়ে খটকা লাগল। ঘরটা একদম নতুন তৈরি মনে হচ্ছে। কাঁচা প্লাস্টারের উপর রং করায় ছোপ ছোপ দাগ। মেঝেতেও ছড়িয়ে আছে চুনরং।

'কী ব্যাপার, স্কুলটা কি নতুন হয়েছে?' ওয়াটার ক্যারিয়ারের কাছে জানতে চাইলেন প্রিসাইডিং অফিসার।

'না স্যার, অনেক পুরনো স্কুল। বারবার হাতি অ্যাটাক করে! দিন পনেরো আগে এক পাল বুনো হাতি এসে পুরো স্কুল গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ভোটের জন্য তড়িঘড়ি আবার তৈরি হয়েছে। প্লাস্টার শুকিয়ে রং করবার মতো সময় হাতে ছিল না। কালই কোনওক্রমে রং করা শেষ হল। এর আগেও অনেকবার ভেঙেছে। ব্যাটারা এত লোভী! ওদের জন্যও বনে মিডডে মিলের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি!'

'তার মানে আজ রাতেও আবার আসতে পারে?' মুখ শুকিয়ে গেল পোলিং পার্টির।

আধুনিক বন্দুক হাতে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় সেনারা বাংলা বোঝে না, ট্রাইবাল ভাষা বোঝা আরও দুষ্কর। তবু হাবেভাবে বোঝার চেষ্টা করল। বুঝলও কিছুটা। কারণ তারা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, 'এলিফ্যান্ট!!'

'চিন্তা করবেন না, বনের লোকজন তো আছেই। হাতি এলে ওরাই তাড়িয়ে দেবে। পটকা, আগুন সবেরই ব্যবস্থা রয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিন, চায়ের ব্যবস্থা করি। রাতে কী খাবেন? বনের নদীর ছোট মাছ খাবেন? ভাল নদীয়ালি মাছ পাওয়া যায় এখানে। শহরে পাবেন না।'

কাগজপত্র মেলাতে বসলেন প্রিসাইডিং। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে চোখ চলে যায় বাইরে বনের দিকে। বিকেল নামছে। গড়াতে গড়াতে সন্ধের দিকে যাচ্ছে। হলদে রোদ ঝকঝকে সবুজ পাতায় অন্যরকম। দু'দিন আগেই বৃষ্টি হয়ে সব পরিষ্কার।

পাখিরা ফিরছে।

ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ির আওয়াজ। বিএসএফের কমান্ডার এসেছেন তাঁর বাহিনীর লোকজনের খোঁজ নিতে। এঁরা বোধহয় বেশির ভাগ রাজস্থানের লোক। কমান্ডারকে ঘিরে ধরে জানতে চাইছেন হাতি এলে কী করবেন। ভোটে এর আগে দুষ্কৃতী, জঙ্গি ইত্যাদি সামলেছেন তাঁরা, হাতির পাল্লায় তো কখনও পড়েননি। দূর থেকে হাবেভাবে প্রিসাইডিং বুঝলেন, তেমন বাড়াবাড়ি হলে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন কমান্ডার সাহেব।

ইতিমধ্যে বনকর্মীরা গল্পে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা গেল।

'মশাই বলবেন না, বড্ড রিস্কে কাজ করি। রিক্রুটমেন্ট নেই, অল্প ক'টা লোক, এত বড় ফরেস্ট। খাবারদাবার নেই, পশুরা করবে কী? ক'দিন আগেই চিতা বাঘ পাশের ওই গ্রাম থেকে ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছে। কতবার মানুষ মেরেছে হাতি। সবাই খেপে আছে। আজ সকালেই আমরা ক্ষোভের মুখে পড়েছি। মানুষের উপর আক্রমণ লেগেই আছে। ফসলের অবস্থারও বারোটা বাজিয়ে দেয় হাতি-বাইসন।'

'তার মানে বাঘও আছে?' মেঝেতে বিছানা। ঘুম আসছে না প্রিসাইডিং-এর। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব আওয়াজ। তন্দ্রা লাগতে লাগতে আবার কেটেও যায়। তার উপর মকপোল নেবার টেনশন!

চারটেয় উঠে পড়লেন তিনি। অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হু-হু হাওয়া দিচ্ছে। তার মধ্যে অন্ধকারের দিকে একে-ফর্টি সেভেন উঁচিয়ে বসে আছে সেনা। বনবস্তি ঘুমাচ্ছে, বন আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।

প্রাতঃকৃত্য সারার প্রস্তুতি নিয়ে প্রাঙ্গণে নামলেই কড়া গলায় আপত্তি জানাল সেনা, 'আরেকটু আলো ফুটুক। এখন কোথাও যাওয়া যাবে না।'

অগত্যা ঘরে ঢুকে অপেক্ষা।

হঠাৎ বাইরে ফিসফাস, আশঙ্কিত গলা। সবাই তখন উঠে পড়েছে। ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা। বনের দিকে তাকিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে চার সেনা, বনকর্মীরা, কিছু স্থানীয় মানুষও চলে এসেছে। আঙুল তুলে সবাই কিছু দেখাচ্ছে, দেখছে।

ভোট ভুলে ভোটকর্মীরাও তখন বনের দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে।

কোথায়!! কী!!!!

হ্যাঁ, একটু একটু দেখা যাচ্ছে। এখনও অন্ধকার পুরো কাটেনি। তার উপর ভোরের কুয়াশা ভাব রয়েছে। মনে হচ্ছে গাছপালার আড়ালে অনেকগুলো কালো কালো কিছু নড়ছে। ডালপালা দুলছে। খসমস আওয়াজ উঠছে। কিছু বকও ওড়াউড়ি করছে।

বনকর্মীরা এগতে লাগলেন। পরের কদমে সেনারা। তারপরে ভোটকর্মীরা। পাশে পোলিং এজেন্ট, কিছু কিছু ভোটার। মকপোল শুরু হতে সাঁইত্রিশ মিনিট বাকি!!

তেনারা এখন কিছুটা দৃশ্যমান হয়েছেন। একঝাঁক। ভোরের আলো ফুটছে। তাদের কোথাও যাবার যেন তাড়া নেই। একটু-আধটু পাতা চেবাচ্ছেন! মশা-মাছি তাড়াচ্ছেন। বকেরা ঘাড়ে বসে পোকা বেছে দিচ্ছে। ভোটকেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তারা একটি সকাল এনজয় করছেন!

'কী হবে!' ফার্স্ট পোলিং প্রিসাইডিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ!

'যদি অ্যাটাক করে?' সেনারা একে-ফর্টি সেভেন তাক করে ফেলেছে।

রে রে করে উঠলেন বনকর্মীরা, 'গুলি না, গুলি না। আমাদের কাজ করতে দিন। ওরা কিচ্ছু করবে না। ওরা এমনিতেই বড্ড ভিতু টাইপের। আমরা তাড়িয়ে দেব।'

পোলিং এজেন্ট বললেন, 'তা ছাড়া খুব দুর্বল হার্ট। ভয় পেলেই স্ট্রোক করে মরবে। চলুন স্যার, মকপোল শুরু করবেন না? সময় হয়ে গেল কিন্তু!'

এ সময়ই এক মোক্ষম প্রশ্ন। রাজস্থানের এক সৈনিক বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'ইয়ে তো বড়ে অজব কা বাত হ্যায়!! ওহ্ সব হাথি কো শুঁড় কিউঁ নহি হ্যায়?' অল্প আওয়াজের লংকা পটকা ছুড়ে দিলেন বনকর্মীরা।

ওয়াটার ক্যারিয়ার বলল, 'ওহ্ তো হাথি নহি হ্যায়, ওহ্ সব বাইসন হ্যায় ভাইসাব। বনমহিষ!'

কতটুকু বুঝল কে জানে। চোখ-মুখ ভরা অপার বিস্ময়। রাজস্থানে তো এমন বন নেই, হাতি নেই, বাইসন নেই। বাড়িতে ফেরার সময় বউ-বাচ্চার জন্য দারুণ গল্প নিয়ে যেতে পারবে।

বাইসনের দলটি পটকার আওয়াজে ক্রমে বনের গভীরে ঢুকতে লাগল। আর ভোটাররা দল বেঁধে বুথে আসতে লাগল।

গুয়া আর গাছপান নিয়ে বুথের ভিতর বেঞ্চে বসলেন টিএমসি-জোট-বিজেপি-র তিন পোলিং এজেন্ট। হাসতে হাসতে তিনজনে বললেন, 'হাতি-বাইসন থাকবেই তো। ভয় নেই স্যার, আমরা আছি। আমাদের মধ্যে শত্রুতা নেই, ওসব বড় নেতারা করে। আমরা এখানে তিন বন্ধুই বসেছি। তিন পার্টি করি, কিন্তু থাকি এক বস্তিতেই। আমাদের কথা বাইরের লোক ভাববে না। মিলমিশ করে না থাকলে হবে?'

ভোট শুরু হল ডুয়ার্সের বনবস্তির এক বুথে। কতকাল আগে আমাকে দিয়ে গিয়েছে এক শাশ্বত চায়ের কাপ!

পথিক বর

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার কাছে আহ্বান রইল এই সংকলনে কবিতা সহ যোগ দেওয়ার। কবিতায় ডুয়ার্স ভূখণ্ডের উপস্থিতি কাম্য। প্রত্যেকে তাঁর সেরা কুড়িটি কবিতা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) বাছাই করে টাইপ করে পিডিএফ ফরম্যাটে মেল করুন ekhonduars.sahitya @gmail.com কিংবা হাতে বা ডাকযোগে হলে পাঠান 'এখন ডুয়ার্স'-এর ডুয়ার্স ব্যুরো অফিসে। (মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি) আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২) বা শুভ্রকে (৯৪৭৫৫০৩৩৪৮)। কবিতা পাঠাবার শেষ তারিখ বাড়িয়ে করা হল মে ৩১, ২০১৬।

চা-বাগানে দেবযানী সবার মাইজি

পিতৃবিয়োগের পর দীর্ঘ ন'মাসের লড়াই। অবশেষে চাকরিটা হয়েছিল। অবশ্য না হওয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তিনি মহিলা। প্রথমে হাসপাতালের হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট। পরে অফিসের জুনিয়র ক্লার্ক। যাঁরা মহিলা বলে চাকরিতে জোর আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের অনুরোধেই আজ বানারহাট চা-বাগানের হেড ক্লার্ক দেবযানী বসু। বাগানের এই 'বড়বাবু' কথাটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন দেবযানী। কারণ, শুধু এইটুকু ফ্রেমেই তিনি বন্দি রাখেননি নিজেকে।

গোটা ডুয়ার্স জুড়ে তাঁর পাখির মতো ওড়াউড়ি দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। নিজের হাতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও পরিচালনা করেন তিনি— বানারহাট ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, সংক্ষেপে বিআইআরডিএস। সংস্থার থিম পরিবেশ। শুধু ফিতে কেটে বৃক্ষরোপণই এর উদ্দেশ্য নয়। সুস্থ সামাজিক পরিবেশের দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশি। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মা-বোনদের নিয়ে জুটের কাজ, উল বোনা শেখানো হয়। সেগুলো বিক্রির জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন তো আছেই। এ ছাড়াও এসএসবি-র সঙ্গে কাজ করা, কাজ শিখতে বা করতে আগ্রহী এমন মহিলাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হয় এই বিআইআরডিএস-এ।

দেবযানীর একটি গানের স্কুলও আছে। নাম মেঘমল্লার। ছোটবেলায় মায়ের কাছেই গান শেখা। মায়েরই অনুপ্রেরণায় গান নিয়ে চর্চা। কিছুদিন আগে 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা'— রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি বিখ্যাত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ৬২ জন মেয়েকে নিয়ে 'তিনকন্যা'র মঞ্চ উপস্থাপনা দেখে ডুয়ার্সবাসী মুগ্ধ হয়েছেন। এই স্কুল নিয়ে আর-একটি কথা দেবযানীর থেকেই জানা গেল, রবীন্দ্রগান ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাতে তাঁরা চর্চা করছেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ।

বান্দাপানি চা-বাগান লক-আউট। দেবযানী সহযোদ্ধাদের নিয়ে ছুটে গেলেন। এক লরি রেশন, জামাকাপড়, ওষুধপত্র নিয়ে। প্রখর গ্রীষ্মে চা-বাগানে ডায়েরিয়া চরম আকার নিয়েছে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে কুলি লাইনে তাঁর দেখা মেলে। একটা চেয়ারে বসে দেবযানী, তাঁকে ঘিরে রয়েছেন আদিবাসী লাইনের কুলিকামিনরা। দেবযানী শেখাচ্ছেন ওআরএস কীভাবে বানাতে হয়, কখন খেতে হয়। এই দাবদাহের মধ্যে কীভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হয়। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের দিচ্ছেন নানারকম টিপস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত ডুয়ার্স টি ফেস্টিভ্যালেও তাঁকে পাওয়া যায়। উপজাতিদের দিয়ে সাংস্কৃতিক সমস্ত উৎসবের দায়িত্ব তুলে দেন জলপাইগুড়ির এসডিও সীমা হালদার। তাঁর হাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেবযানী রাভা, মুন্ডা, মেচ, লিম্বু উপজাতিদের দিয়ে বেশ কিছু আকর্ষণীয় বিনোদন উপস্থাপনা করেন। তিন বছর ধরে তাঁর সহসম্পাদনায় 'বাংলার ডুয়ার্স' নামক একটি বার্ষিক পত্রিকা ডুয়ার্সে প্রকাশিত হচ্ছে। ছকে বাঁধা সংসার তাঁর জন্য নয়, বুঝেছিলেন অনেক আগেই। তাঁর জন্য আছে বিশ্বসংসার। তাই একটু অন্যরকম করেই জীবনযাপন বেছে নিয়েছেন বানারহাট চা-বাগানের 'মাইজি'। আর সেটাই দেবযানীর নিজস্ব ছন্দ। বেঁচে থাকার আনন্দ।

ব্রততী ঘোষ

সমাজে স্বার্থপররা সংখ্যায় বেশি নয়

প্র: আমার জীবনে যে ক'টি বছর আমি পার করে এসেছি, তাতে মনে হয়েছে, এ পৃথিবীর সকলেই আসলে স্বার্থপর। কোনও ভাল কাজের মূল্য নেই। যারা এতটা স্বার্থপর, তাদের প্রতি আচরণে আমারও কি তবে স্বার্থপরই হওয়া উচিত?

সূচনা সূত্রধর, দশম শ্রেণি

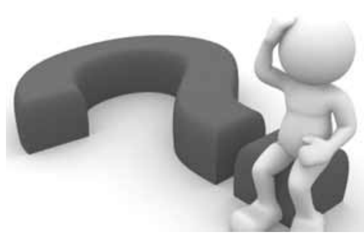

উ: তোমার সঙ্গে যদি কিছু মানুষ স্বার্থপর আচরণ করে থাকে তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষই এমন— এই ধারণা তাৎক্ষণিক। এর যৌক্তিকতা কিংবা সত্যতা নেই। তুমি চোখ মেলে দেখতে অভ্যেস করো। দেখবে, তোমারই চারপাশে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিতান্তই স্বার্থপর নন। তুমি শান্ত মনে, স্থির বুদ্ধিতে তোমার অভিজ্ঞতাকে দেখতে থাকো। কখনও কি এমন বন্ধু, এমন আত্মীয়, এমন চেনাপরিচিত একজন মানুষ সত্যিই দেখোনি, যে বা যিনি স্বভাবে কোঅপারেটিভ? ভেবে দেখবে— নিশ্চয়ই দেখেছ।

এমন বেশ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে অন্যকে রক্ষা করেন, নিরলসভাবে সমাজের জন্য কাজ করেন। যখন কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায়, শত শত মানুষ তার অসহায় শিকার হয়ে পড়ে অথবা কোনও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে— তুমি জানবে, বহু সাধারণ মানুষ তখন ছুটে যান ত্রাণকার্যে।

তোমার মনে হয়েছে, চারদিকে যখন স্বার্থপর মানুষের ভিড় তাহলে তুমিও তাদের মতোই হবে কি না! আমার মনে হয়, এই কথাটি তুমি বলছ নিতান্ত ক্ষোভ থেকে। একটা কথা মনে রাখা খুব জরুরি— নিজের ভাল, নিজের মঙ্গল দেখাও কিন্তু মানুষের নিজেরই দায়িত্ব, নিজেরই দায়। তাতে দোষ কিছু নেই। তোমার অস্তিত্বকে সুন্দর করে, যথাযথ করে তুমিই তো টিকিয়ে রাখবে। কিন্তু নিজের মঙ্গলার্থে তুমি যদি অন্যের ক্ষতি করতে প্রস্তুত হয়ে যাও— স্বার্থপর সমাজ তখনই গড়ে ওঠে। তোমার ক্ষোভ দেখে, অভিমান বুঝতে পেরে আমার কিন্তু মনে হয়েছে, স্বার্থপর, হীন মানুষের দলে মিছিল করতে তুমি নিজেই কোনও দিন চাইবে না।

মধুপর্ণা রায়

শ্রীমতী ডুয়ার্সে একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হল 'প্রশ্ন-উত্তর ডট কম'। আপনাদের যে কোনওরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধানের উত্তর দেবেন মধুপর্ণা রায়, শিক্ষিকা, সুনীতিবালা চন্দ সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। চাইলে প্রশ্নকর্তার পরিচয় গোপন রাখা হবে। প্রশ্ন পাঠান 'এখন ডুয়ার্স' দপ্তরে।

স্মৃতির ডুয়ার্স

কংক্রিট-জীবনের তলে চাপা পড়ে মেটেলির দিনগুলি

ডুয়ার্সের মেটেলি তখন বৈদ্যুতিক সংযোগহীন ছোট্ট একটি গ্রাম। সাতের দশকের শেষ দিকের কথা। বাবা মেটেলি হাই স্কুলের শিক্ষক আর মা গার্লস' স্কুলের। স্কুল কোয়ার্টারের দুটো ঘরে আমরা তিনজন। দেওয়াল টপকে পাশের ঘরেই থাকতেন প্রধান শিক্ষক অরুণ খাসনবীশ তাঁর মাকে নিয়ে। আমি 'কাকু' আর 'ঠাকুমা' বলে ডাকতাম। অরুণকাকু ছিলেন স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের দাদা। আত্মীয় না হয়েও যে পরমাত্মীয় হয়ে ওঠা যায় তা আমি কাকু আর ঠাকুমার কাছে শিখেছি। আমাদের শহুরে জীবনে যেমন সব্বাইকে বড্ড অচেনা লাগে, যেন কেউ কারও নয়, কিন্তু আমার ছোটবেলায় দেখেছি, সবাই যেন আমরা 'পরের তরে'। অসুস্থতার সময় তা বিশেষ করে বুঝতে পারতাম। কাকু আর ঠাকুমার উদ্‌বিগ্ন মুখ আমাকে এতটাই ভরসা দিত যে, তা আজও কোনও বড় বড় চিকিৎসকের মধ্যেও খুঁজে পাই না। কাকুর কাছে আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি আর ঠাকুমার কাছে ঘরকন্নার।

সারা সপ্তাহের পর রবিবার দিনটা ছিল আমাদের উৎসবের দিন। সে দিন হাটখোলায় হাট বসত। বাবা হাটে যেতেন। সারা সপ্তাহের বাজার করে আনতেন সে দিন। ওই একদিনই আমাদের মাছ-মাংস খাওয়ার দিন। যেন কী একটা ঘটে যাওয়ার আনন্দ।

মেটেলি আমার প্রাণের গ্রাম। ভোর পাঁচটায় ভোঁ পড়ত চা-বাগানে। ঘুম থেকে উঠে পড়তাম আমরা। বারান্দায় দাঁড়াতাম। সামনে পাহাড়। আকাশ জুড়ে নানান রঙের খেলা শুরু হত এ সময়টায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখতাম টুপ করে হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল সূর্য। বাবা সূর্যপ্রণাম শিখিয়েছিলেন। সর্বশক্তিমান, সকল প্রাণের উৎসকে প্রণাম জানিয়ে আমার দিন শুরু হত। সারাটা দিন আপন মনে বয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যেটা বড় মায়াময় হয়ে উঠত। পড়তে বসে কানে আসত মাদলের আওয়াজ। বাগানের শ্রমিকরা সারাদিনের খাটাখাটনির পর হাড়িয়া খেয়ে মাদল বাজিয়ে শরীরে ছন্দ তুলত। ওটা ছিল ওদের আনন্দ কুড়িয়ে নেবার একটা নিজস্ব পন্থা। অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যেত সেই আওয়াজ। তারপর সব নিশ্চুপ। ভোর পাঁচটায় আবার সাইরেন।

কখনও কোনও বিকেলবেলায় বন্ধুরা মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যেতাম ট্রেন লাইনের কাছে। লাইনের উপর বসে বসে গল্প করতাম। রাখালরা বাড়ি ফিরত তাদের গোরু নিয়ে। ঘণ্টা বাজত গলায়। খড়ি বোঝাই মাথা, ফিরত কুলিমজুররা। মেটেলির এই গ্রাম্য পরিবেশ আমাকে ভাল মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। ডুয়ার্সের প্রকৃতির কোল আমাকে লালন করেছে পরম মমতায়, অনেক আদরে। বিবাহোত্তর জীবনে এসে ইট, পাথর আর কংক্রিটের আবর্জনার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে সেসব দিন, কিন্তু মরে যায়নি। এরকমই হঠাৎ হঠাৎ উঁকি মেরে জানিয়ে দেয়, স্মৃতি হয়ে আজও বেঁচে আছি তোর মনের কোণে, দেখ, ঠিক দেখতে পাবি আমায়।

শর্বরী দত্ত

বই পত্রের ডুয়ার্স

উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন বিষয়ক আলোচনা

উন্নয়নের সঙ্গেই উচ্ছেদ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। উন্নয়নের সঙ্গে সন্ত্রাসের যোগও তেমনই। পুনর্বাসনের কথাও বলা হয়। সে শব্দও জুড়ে গিয়েছে উন্নয়নের সঙ্গে। অর্থাৎ উন্নয়ন করতে গেলে উচ্ছেদ হবেই। আর সামনে ঝোলানো হবে পুনর্বাসনের মুলো। সত্যি কথা বলতে কী, প্রকৃত অর্থে কি পুনর্বাসন সম্ভব? পাহাড়-জঙ্গলের স্বাধীনচেতা মানুষদের যদি না জোর করে কিংবা লোভ দেখিয়ে তাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ, তাদের প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে উচ্ছেদ করে কলোনি জীবনে প্রোথিত করা হয়, তবে কি তাকে পুনর্বাসন বলা যাবে?

উন্নয়ন নিয়ে, পুনর্বাসন ঘিরে উন্নয়নের নামে সন্ত্রাস ও মৃত্যু এবং বেঁচেবর্তে থাকা মানুষদের উচ্ছেদ নিয়ে—এমনই নানা প্রশ্ন তুলেছেন সৌমেন নাগ তাঁর 'উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন/ আমি কানহো আমি সিধোহ/ এ আমার দেশ' গ্রন্থে। চোদ্দোটি অধ্যায়ে বারবার ফিরে এসেছে আদিবাসী মানুষের কথা। আর সেটাই স্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানী ড. ওয়াল্টার ফার্নান্ডেজ একটা হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি বাঁধ, খনি ও রেল লাইন তৈরির মতো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ছ'লক্ষ মানুষ আড়াই লক্ষ হেক্টর জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এঁদের ৪০ শতাংশই আদিবাসী। অথচ ভারতে আদিবাসীদের সংখ্যা ৮.০৮ শতাংশ। অন্য আর-একটি তথ্যসূত্র 'দ্য রিপোর্ট অব দি এলিফ্যান্ট টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট'-এ দেখছি, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খোলামুখ খনির বৃদ্ধির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.০৬ শতাংশ। সেখানে ওই সময়ে ভূগর্ভস্থ খনি বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৭ শতাংশ হারে। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৬ সাল অবধি খনি প্রকল্প ৯৫ হাজার হেক্টর বনভূমি গিলে খেয়েছে। ওই উন্নয়নের বলিও আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষ এবং অসংখ্য বন্য প্রাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়ে এই খনির প্রভাব, বাস্তুচ্যুত মানুষ, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বনবাসীদের উপর কী প্রভাব ফেলেছে, সে আলোচনাও রয়েছে। সৌমেন নাগ লিখছেন, 'প্রকল্পের জন্য জমি প্রয়োজন, এর কোনও বিরোধিতার প্রশ্ন নেই। কিন্তু যারা এই প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা যদি প্রকল্পের অন্যতম পালনীয় দায়িত্ব বলে গ্রহণ না করা হয় তবে সেই প্রকল্প উন্নতির সোপান হতে পারে না।'

এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় ওড়িশার নিয়মগিরির ডোঙরিয়া কন্ধদের কথা। নিয়মগিরি খুঁড়ে বক্সাইট তুলবে বেদান্ত

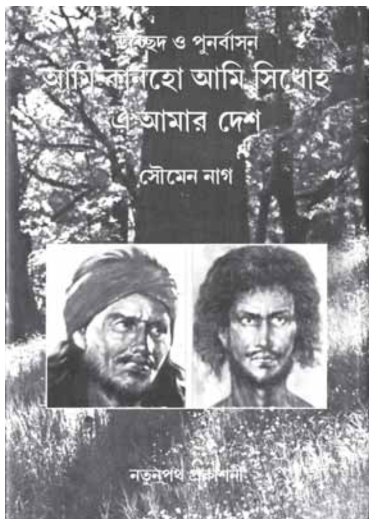

রিসোর্স। ডোঙরিয়ারা তা হতে দেবে না। কেন? ওই সমাজ পরিবেশের কথা। বড় সহজ করে সে কথা লিখেছেন অধ্যাপক পরিমল ভট্টাচার্য।

'বক্সাইটের জটিল রসায়ন ডোঙরিয়া কন্ধরা হয়ত সেভাবে জানে না। কিন্তু এই পাহাড়ের মাটি, মাটির উদ্ভিদ, উদ্ভিদের শিকড় চুঁইয়ে নানা রসের ধারায় যে প্রকৃতির নিয়ম রয়েছে, সেটা জানে। ওরা নিজেদেরকে বলে মাটিরো পোকো— মাটির পোকা, অর্থাৎ কেঁচো। মাটি ছাড়া কি কেঁচো থাকতে পারে? ওদের কাছে পবিত্র এই নিয়মগিরির মাটি।' (সত্যি রূপকথা, পরিমল ভট্টাচার্য)। কোনও পুনর্বাসন এমন আর কি রূপকথার জন্ম দিতে পারে? পারে না। ডোঙরিয়ারা আজও লড়ছে।

এমন লড়াইয়ের কথা এসেছে আলোচ্য বইটিতে। বইয়ের নামকরণে যা স্পষ্ট। সিধু, কানু, তিলকা মাঝির কথা। ইংরেজ আর মহাজনদের বিরুদ্ধে আদিবাসী বিদ্রোহের কথা। ছুঁয়ে গিয়েছে সিঙ্গুর ও রাজারহাটের কথাও। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি, ভূমি সমস্যা, সংস্কার, অপারেশন বর্গা ও তার সীমাবদ্ধতা টেনে এনেছেন লেখক। না হলে এ রাজ্যের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা এবং পুনর্বাসনের প্রেক্ষিতটা সহজে বোঝা যায় না। সকলেই উন্নয়নের কথা বলে। আসলে কার কথা বলে, কীসের বিনিময়ে কার উন্নয়ন? কার উন্নতি? সকলের উন্নতির চাবিকাঠিটা কী? অমোঘ প্রশ্ন, ততই জটিল তার উত্তর। মতানৈক্যের চেয়ে সেখানে মতভেদই বেশি। সেই জটিল বিতর্ক নিয়েও কাঁটাছেঁড়া করতে চেয়েছেন লেখক। আবার অন্যত্র দেখিয়েছেন, উন্নয়নের নামে তাড়া তাড়া মিথ্যে ভরা দলিল হাজির করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। যেখানে দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি। চোখের পলক না ফেলে বলে দেওয়া হয়েছে কোনও জলাভূমি নয়। যেখানে তিনফসলা জমি, সেখানে বলে দেওয়া হচ্ছে একফসলা। এই মিথ্যে ভিতের উপর প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের কোনও সৌধ তৈরি হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য বইটিতে তিনি চা শ্রমিকদের দুর্দশা ও অনাহার, অপুষ্টিতে মৃত্যুর প্রসঙ্গও তুলে এনেছেন। উন্নয়নের সামান্য ছোঁয়া থেকে কীভাবে বঞ্চিত এই শ্রমিকরা, তার রূপরেখা সেখানে স্পষ্ট করেই এঁকেছেন।

একইভাবে বন ও বনের অধিকার নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাতও করেছেন। এসেছে একের পর এক জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য থেকে হাজার হাজার বনবাসীকে উচ্ছেদের কথা। অন্য দিকে বনাধিকার স্বীকার আইন, ২০০৬ কীভাবে আমাদের রাজ্যে স্রেফ অকেজো করে রাখা হয়েছে, সে কথাও। বিগত সরকারের আমলে কোনওভাবেই এই আইন অনুযায়ী বনবাসীদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। উলটে আইনের মূল স্তম্ভগুলিকেই নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। বর্তমান সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সে প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করে না। বন মাফিয়া, রাজনীতিক এক শ্রেণির বনাধিকারিক হাত মিলিয়ে বন লুট করে চলে। অথচ এই আইন খুব স্বাভাবিক পথেই বনবাসীদের সামনে উন্নয়নের দরজা খুলে ধরেছিল। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষুব্ধ বনবাসীরা ও তাদের সংগঠন স্থির করে, দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্সের বনবস্তির বাসিন্দারা কোনও দলকেই ভোট দেবে না, 'নোটা' প্রয়োগ করবে। তাদের লড়াই কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে বা হবে, সে কথা ভবিষ্যৎই বলবে।

উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন/ আমি কানহো আমি সিধোহ/ এ আমার দেশ। সৌমেন নাগ।
নতুনপথ প্রকাশনী। মূল্য ৪০০ টাকা

দেবাশিস আইচ

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের ময়দানে শূন্যতা

‘অজাতশত্রু’ কথাটা অভিধানে থাকে। বাস্তবে এমন মানুষ দেখা যায় না, যাঁর কোনও শত্রু নেই। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমীদের মধ্যে অঞ্জন সেনগুপ্ত বোধহয় একজন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন ২২ বছর ধরে। দক্ষ সংগঠকের পাশাপাশি দৃঢ়চেতা প্রশাসক হিসেবেও উজ্জ্বল থেকেছেন। কাউকে এই মানুষটি সম্বন্ধে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুনিনি। আমি জেলাস্তরে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ক্রিকেট খেলেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, খেলার মাঠে দুটো টিমের রেষারেষি থেকে জন্ম নেওয়া ধুন্ধুমার গন্ডগোল কী অনায়াসে সামলে দিয়েছেন অঞ্জনদা। চাপের মধ্যে হিমশীতল থাকার ঐশ্বরিক শক্তি ছিল মানুষটার। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরে চাকরি করতেন অঞ্জনদা। শুনেছি নিজে ভাল খেলতেন। জেলা, এমনকি রাজ্যস্তরেও ক্রিকেট খেলেছেন।

অঞ্জন সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় আটের দশকের শেষ দিকে। আমরা তখন স্কুলছাত্র। আমাদের দু’-চারজন অসমসাহসী বন্ধুবান্ধব স্কুল পালিয়ে দুপুরের শো-এ হিন্দি সিনেমা দেখতে যেত। আমরা যারা একটু ভিতু টাইপ, তারা শীতের মরশুমে শনিবার করে বা কোনও কারণে স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেলে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ছুটতাম ক্রিকেট মাঠে। টাউন ক্লাব তখন শহরের সেরা টিম। ক্রিকেটের মরশুমে টাউন ক্লাবের খেলা থাকলে স্টেডিয়ামে দু’জনের দেখা পেতাম অবধারিতভাবে। শহরের বিশিষ্ট মানুষ চা-ব্যক্তিত্ব এস পি রায়ের ছেলে ধ্রুবদা আর অঞ্জনদা। ধ্রুবদা গম্ভীর মুখে বসে থাকতেন স্টেডিয়ামের একদম নিচের ধাপে। আর অঞ্জনদাকে দেখতাম বাউন্ডারি লাইনের একধারে পায়চারি করছেন প্রবল উৎকণ্ঠার জলছবি মুখে এঁকে।

আটের দশকের শেষ দিকে স্কুল ক্রিকেটে খেলতে শুরু করি। দৈবক্রমে স্কুলের একটা ম্যাচে সেঞ্চুরি করে ফেলেছিলাম। প্রথম বছর ক্রিকেট লিগ খেলেছিলাম অগ্রগামী সংঘর হয়ে। কিছু রান-টান করেছিলাম। সেবার একটা ডাবল উইকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল ডিএসএ। আমি সেরা ব্যাটসম্যানের পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেসব কারণেই হয়ত অঞ্জনদার চোখে পড়ে যাই। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। পরের বছর অঞ্জনদা টাউন ক্লাবে খেলার প্রস্তাব নিয়ে আসেন আমার কাছে। সে সময় টাউন ক্লাবে খেলার সুযোগ পাওয়া ছিল খেলোয়াড়দের কাছে বেশ একটা গর্বের ব্যাপার। কাজেই অঞ্জনদার প্রস্তাব পেয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি।

টাউন ক্লাবে যখন খেলেছি, তখন একেবারে কাছ থেকে দেখেছি মানুষটাকে। খাঁটি সোনার মতো হৃদয়। একটা অদ্ভুত গুণ ছিল অঞ্জনদার। শহরের সব টিমে যত ছেলে ক্রিকেট খেলে, তাদের প্রায় সবাইকে নাম ধরে চিনতেন। আর-একটা গুণ ছিল মানুষটার। অঞ্জনদাকে কখনও কারও সমালোচনা করতে শুনিনি। নিয়ম করে

প্রয়াত অঞ্জন সেনগুপ্ত

হাজির থাকতেন ক্লাবের প্র্যাকটিসে। কেউ প্র্যাকটিস কামাই করলে খোঁজ নিতে চলে যেতেন তার বাড়িতে।

টাউন ক্লাবের ম্যাচের দিন সকাল থেকে অঞ্জনদা মাঠে হাজির। কোনও দিন এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে দেখিনি। পরে টাউন ক্লাব ছেড়ে অন্য দলেও খেলেছি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক একই রকম মধুর থেকেছে। যখন যে প্রয়োজনে গিয়েছি, অঞ্জনদা হাসিমুখে সে প্রয়োজন মিটিয়েছেন। চেনা-আধচেনা যে কোনও খেলোয়াড়ের জন্য ওঁর দরজা ছিল সব সময় খোলা।

জেলা প্রশাসনিক ভবনে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল আমাদের। অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, তুই এমন মোটা হয়ে গিয়েছিস কী করে! হেসে বললাম, ক্রিকেট খেলার জুতো তুলে রেখেছি অনেক বছর হল। খেলা ছেড়ে দিলে মোটা হওয়াই তো দস্তুর। অঞ্জনদা ধমক দিয়ে বললেন, ওসব আমাকে বোঝাস না। নিয়ম করে হাঁট, এক্সারসাইজ কর, মেদ ঝরিয়ে ফেল শিগগিরি। ভেটারেন’স টিম হচ্ছে আমাদের জেলার। এই শীতে বেশ কিছু খেলা থাকবে। সেই টিমে খেলতে হলে ১০ কেজি ওজন কমাতে হবে। তখন জানতাম না, সেটাই আমাদের শেষ দেখা।

অঞ্জনদা ১৯৮০ সাল থেকে কাজ শুরু করেছিলেন ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে। সে বছরই জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সচিব পদে নির্বাচিত হন। জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিবের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে। গত বাইশ বছর ধরে সেই পদেই ছিলেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা আর তাঁর নাম ছিল একে অন্যের পরিপূরক। শুধু তা-ই নয়, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর কার্যকরী কমিটির সদস্যও ছিলেন অঞ্জনদা। বছর দুয়েক আগে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে রাজ্যস্তরের একটি পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। দোলযাত্রার দিন ভরতি হয়েছিলেন জলপাইগুড়ির একটি নার্সিং হোমে। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতায়। ফিরে আসার পর আবার নতুন উপসর্গ শুরু হয়। ২৩ এপ্রিল ভরতি হয়েছিলেন শহরের একটি নার্সিং হোমে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসা হয়নি তাঁর। ২৫ এপ্রিলের এক বুধ-সন্ধ্যায় ডুয়ার্সের খেলাধুলোর ময়দানকে এক অনন্ত শূন্যতার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে চিরকালের জন্য চলে গেলেন অঞ্জনদা।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

অঞ্জন স্মরণে আলিপুরদুয়ার

অঞ্জন সেনগুপ্তর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার ইনডোর স্টেডিয়ামে। সভায় সভাপতির আসনে বসেন ডুয়ার্সের বর্ষীয়ান ফুটবলার কল্যাণ উদয় মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন বিমল লোধরায়, সোমশংকর দত্ত-সহ বহু ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। বক্তারা তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন যে, উনি কখনও আলিপুরদুয়ারকে আলাদা চোখে দেখতেন না। নিজের সন্তানের মতো আগলে রাখতেন খেলোয়াড়দের। তাঁর মৃত্যুতে আলিপুরদুয়ারের ক্রীড়াজগৎ অভিভাবক হারাল।

পরিতোষ সাহা

ফুটবল কোচিং ক্যাম্প

গত ১৪ এপ্রিল থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ফুটবল কোচিং ক্যাম্প। এই মরশুমের কোচিং ক্যাম্প চলবে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। ক্যাম্পে উৎপল মজুমদার, প্রণব দাস, স্বপন পাল এবং নারায়ণ গোস্বামীদের তত্ত্বাবধানে খুদে ফুটবলারদের প্রশিক্ষণ চলছে।

আন্তঃজেলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

সিএবি পরিচালিত আন্তঃজেলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে হুগলির চুঁচুড়ায় পৌঁছাল কোচবিহার জেলা সিনিয়র ক্রিকেট দল। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িকে হারানোর পর এবার তাদের খেলতে হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর ও বর্ধমান ক্রিকেট দলের সঙ্গে। এই গ্রুপের মধ্যে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে, তার সঙ্গে অন্য গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের ফাইনাল ম্যাচ হবে। সে ক্ষেত্রে এই গ্রুপ থেকে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হলে সে ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পাবে না। কোচ, ম্যানেজারসহ ১৬ জনের ওই দলের ক্যাপ্টেন জয় রাউথ। এই টুর্নামেন্টে জয়ের ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট আশাবাদী বলে জানান কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব বিষ্ণুব্রত বর্মন।

চ্যাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জ

কোচবিহারে অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃমহকুমা ক্রিকেট লিগে মেখলিগঞ্জ ক্রিকেট টিম জোন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে । সদ্যসমাপ্ত এই খেলায় মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমার অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করে। কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে শেষ দিনের খেলায় তুফানগঞ্জের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে জিতে রানার্স হয় দিনহাটা।

রাজ্য অ্যাথলেটিক মিটে কোচবিহারের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ

রাজ্য অ্যাথলেটিক মিটে অংশগ্রহণের জন্য কোচবিহার জেলা থেকে বাছাই করা হয়েছে ১৭ জন প্রতিনিধিকে। ৮ জুন কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক সংস্থার উদ্যোগে যে রাজ্য অ্যাথলেটিক মিট হতে চলেছে, তাতে এই প্রথম এতজনের একটি দল যাবে। ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলার এই দল দৌড়, জ্যাভলিন, ডিসকাস, লং জাম্প, হাই জাম্প-সহ বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করবে। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ১৭ জনকে নিয়ে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ট্রেনিং ক্যাম্প হবে, যার দায়িত্বে থাকবেন বিনয় বোস, শাহ আলম, সিদ্দিক খান এবং শিবেন রায়। কোচবিহারে এ ধরনের ক্যাম্প এই প্রথম বলে দাবি জেলা ক্রীড়া সংস্থার।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

আলিপুরদুয়ার জেলা ফুটবল লিগ

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ২০১৬-র ফুটবল লিগ শুরু হচ্ছে আগামী ১২ জুন থেকে। লিগের ম্যাচগুলি হবে আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, কালচিনি, বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়ির বিভিন্ন মাঠে। জেলা ক্রীড়া সচিব সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, লিগে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ক্লাবগুলিকে ১৫ মে তারিখের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে জেলার বহু ক্লাবই লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

পরিতোষ সাহা

নৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

শুল্কাপাড়া নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটি আয়োজিত 'এন-৯ নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হল নাগরাকাটায়। ৫-৮ মার্চ, ২০১৬ চার দিনের এই নৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এথেলবাড়ি, মালবাজার, খয়েরবাড়ি, হ্যামিলটনগঞ্জ, ক্রান্তি, চামুর্চি প্রভৃতি এলাকার ১৫টি ক্রিকেট ক্লাব। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কয়েকটি ম্যাচ পিছিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে সেগুলি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।এই টুর্নামেন্ট ঘিরে মালবাজারসহ আশপাশের এলাকার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ছিল প্রবল উত্তেজনা।

বিজয় মন্ডল

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

হেলিকপ্টারের পাখার বেয়ারিং খারাপ হয়ে যাওয়ায় ক'দিন ঘোরাঘুরি করতে পারিনি। তা সে দিন পটলরাম পর্যটকের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে আসল কথা না বলে বানিয়ে বানিয়ে বললুম, 'আরে বলো না! ঠান্ডা লেগে চোখ লাল হয়ে কী ঝামেলা! প্রহেলিকা বানাতেই পারিনি।'

'যা বললে, তাতেই তো একটা জায়গার নাম পেলেম গো!' পটল জবাব দিল, 'ধরতে পেরেছ তো?'

না, পারিনি। আপনি পারলেন?

২

আচ্ছা, বলুন তো— ডুয়ার্সের এক রাজবংশের কোন পদবির মুড়ো-ল্যাজা জুড়লে রাত্তির হয়? সূত্র চাই? তবে বলি, প্রথম দুইয়ে King বোঝায় আর শেষ দুইয়ে How।

৩

একটা নদী আছে ডুয়ার্সে। সে নদী এমন নদী, যে মাঝখান থেকে Raw ব্যাপারটা তুলে নিলে বাকিটা দিয়ে কদলি মেলে। কোন নদী?

৪

এক সাহেব সে দিন নাকি পটলরামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে কোত্থেকে আসছে? সাহেব বলে কথা। তাই পটলরাম জায়গাটার নাম ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলেছিল, 'ডে ওয়াকিং।' সাহেব বোঝেনি। তবে আমরা বুঝেছি। এবার বলুন দেখি 'ডে ওয়াকিং'-এর বাংলা!

পয়লা এপ্রিল সংখ্যার উত্তর — ১) বার্নেশ ২) হাসিমারা ৩) কুমারগ্রাম।

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

ডুয়ার্সের ডিশ

ডিম-বাঁধাকপি কষা

উপকরণ- ডিম ২টো, বাঁধাকপি, তেজপাতা ১টা, ১টা শুকনো লংকা, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, লংকা বাটা, গোলমরিচ, জায়ফল বাটা, হলুদ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী- প্রথমে বাঁধাকপি কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে রাখতে হবে। তারপর একটি ছোট পাত্রে দুটো ডিম ফেটিয়ে তার মধ্যে অল্প আদা বাটা, লংকা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে আবার মিশ্রণটিকে ফেটাতে হবে। এর পর কড়াইতে তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে প্রথমে ডিমের মিশ্রণটি দিয়ে ডিমের ঝুড়ি ভেজে সেটিকে অন্য পাত্রে রেখে কড়াইতে আবার তেল দিয়ে তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। এর পর তাতে ঝিরি করে কেটে রাখা বাঁধাকপি দিয়ে ভাল করে ভাজতে হবে। বাঁধাকপি ভাল করে মজে গেলে তাতে অল্প নুন ও হলুদ দিয়ে ডিম ভাজাটা ওর মধ্যে মেশাতে হবে। এবার সামান্য জায়ফল বাটা ও অল্প জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে মাখা মাখা করে নামিয়ে নিলেই 'ডিম বাঁধাকপি' তৈরি। গরম গরম ভাত, রুটি বা পরোটার সঙ্গে খেতে খুবই ভাল লাগে।

সুব্রত বসু, জলপাইগুড়ি

শখের বাগান

যেখানে খুশি লাগান লিলি

গাছ ভালবাসেন, ফুলও; কিন্তু বাগান করার সময় খুব একটা দিতে পারেন না, তাঁদের জন্য লিলি ফুল গাছ আদর্শ। বাজার থেকে কিছু লিলির কন্দ (বাল্‌ব) নিয়ে এসে বাড়ির যেখানে খুশি বুনুন, চাইলে টবেও লাগাতে পারেন। মাটি, টব, বালতি, প্লাস্টিক প্যাকেট— যেখানে খুশি লাগালেই লিলি ফুটবে। মে মাসে পুঁতে দিন, আর বেমালুম ভুলে যান। বর্ষাতেও লাগাতে পারেন। খোলা জায়গায় রেখে দিন, কোথা থেকে সার-জল সংগ্রহ করে এ গাছ কে জানে? চৈত্র মাসের মাঝামাঝি দেখবেন বড় বড় স্টিকে মাইকের চোঙের মতো ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কেটে ঘরে জল দিয়ে ফ্লাওয়ার ভাসে রাখলে বেশ কয়েকদিন সতেজ থাকে। সুদৃশ্য টবে দু'-তিনটি কন্দ লাগালে বছর শেষে দেখা যাবে গোটা টব অসংখ্য গাছে ভরে গিয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall

HOTEL Green View

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (0), 9434756733 (M)

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

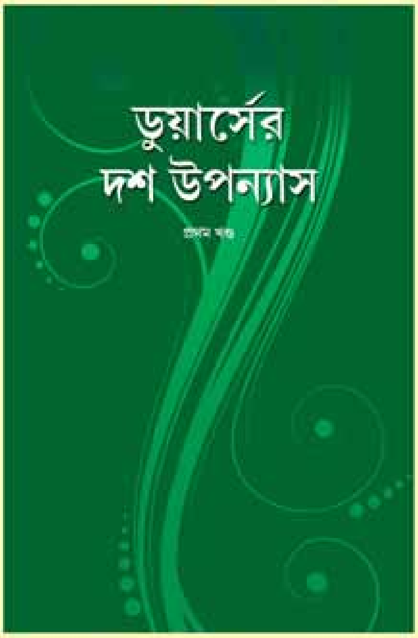

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

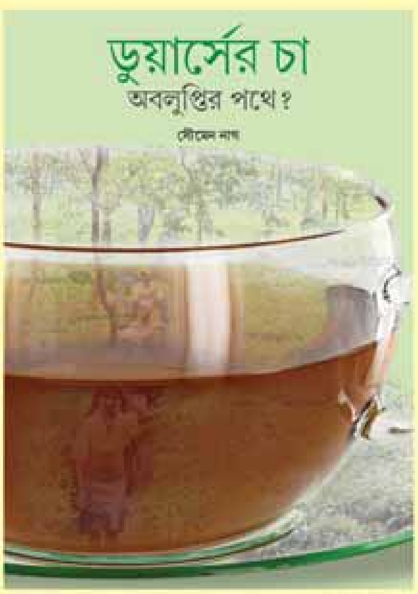

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য ১৫০ টাকা।

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

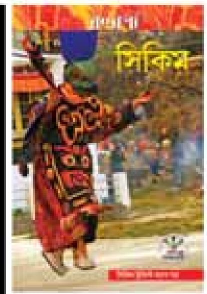

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

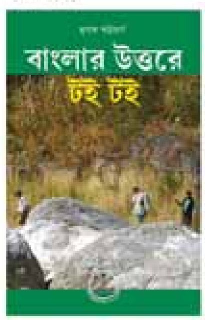

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

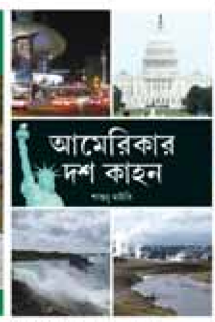

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

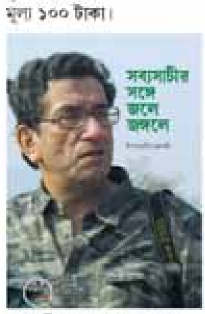

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.